

UPAMOHADESH Koyekjan Biggani

Prof. Dr. A. M. Harun Ar Rashid

উপমহাদেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী

এ এম হারুন অর রশীদ

banglainternet.com

সূচিপত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী	৯
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পথিকৃৎ রসায়নবিজ্ঞানী	১৭
রামানুজান, একটি প্রহেলিকা ও একটি বেদনাময় স্থিতি	২৩
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী	২৯
মেঘনাদ সাহা, প্রথম জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী	৩৫
সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব	৪১
কাজী মোতাহার হোসেন, সংখ্যায়নের মোতিহার	৫২
মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, বিজ্ঞানসাধক ও সংগঠক	৬০
সুব্রাহ্মণিয়ান চন্দ্রশেখর, সত্য ও সন্দরের পূজারি	৬৬
আব্দুস সালাম, এক ব্যতিক্রমী বিশ্বব্যক্তিত্ব	৭২

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী

অবিভক্ত বাংলায় রেনেসাঁ ঠিক কোন বছর থেকে শুরু হয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তারিখ থেকে এই পুনর্জাগরণকে চিহ্নিত করতে পারি। এটাই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন। শুধু তাই নয়, এর ঠিক তিন বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগদীশচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দু'জনে মিলে বাংলার বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তাই বোধ হয় বাংলার রেনেসাঁ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এটা পালাবদলের একটা বিশেষ মুহূর্ত। জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন একুশ এবং যে বছর তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন সেই বছর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদূর জার্মানির উলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন এলবার্ট আইনস্টাইন। আর ঠিক সেই বছরই মহাপ্রয়াণ ঘটে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ত্বের জন্মদাতা জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের। ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেই জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবীর বিজ্ঞানীসভায় স্থায়ী আসন লাভ করেন এবং আইনস্টাইনও ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি নিয়ে গভীর আলোচনার মাধ্যমেই দেশকাল সঙ্ক্ষে মানুষের ধারণা চিরদিনের জন্য বদলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মনে রাখা দরকার যে, ঐ একই বছর দস্তয়ভস্কি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ব্রাদার কারামাজভ' প্রকাশ করেন এবং জার্মানির বার্নার ফন সিমেন্স বার্লিনের বাণিজ্য প্রদর্শনীর জন্য প্রথম বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন তৈরি করেন। সুতরাং ইউরোপ সেদিন দ্রুত বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক আবহে প্রবেশ করছিল— যার ছোঁয়া বাংলায় এসেছিল অনেক ধীরে। যারা সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এবং কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রথম।

জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ তখনকার বাংলায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনটি আন্দোলনের স্রোতধারা পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল। এর একটা ছিল মূলত হিন্দু ধর্মীয়— যার পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এটাকে হিন্দু ধর্মীয় বিপ্লবও বলা চলে, কেননা শতাব্দীর কুসংস্কার আর গোড়ামির ফলে হিন্দুসমাজে যে আধ্যাত্মিক স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় তার মধ্যে আবার প্রাণের স্পন্দন আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তাঁর ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনও আসলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তবু তিনি তাঁর পুত্রকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন একটি সাধারণ বাংলা স্কুলে— যেখানে, তাঁর ভাষায়, 'দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র এবং বামদিকে ধীর পুত্র আমার সহচর ছিল।' মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং নিম্নবিত্ত মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পূর্ববাংলার শিক্ষাজীবন এভাবেই গুরু হয়েছিল— যার উজ্জ্বল ফসল জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরো অনেকে।



সেদিনকার বাংলায় দ্বিতীয় আন্দোলন ছিল ঐ শিক্ষা প্রসারের— যার প্রাথমিক প্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যের আসিকে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের গোড়াপত্তন করলেন। তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষা ছিল হিন্দু পণ্ডিতের সংস্কৃত-সমৃদ্ধ বাক্যজালের অষ্টোপাশ বন্ধনে মুমূর্ষু। বঙ্কিমচন্দ্র সেই নাগপাশ থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিলেন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির যাদু দিয়ে। কিন্তু একই সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের ইতিহাস থেকে কিছু শাসক মুসলিম চরিত্র নিয়ে এবং বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের উপস্থাপিত করে তিনি বপন করে গেলেন চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িকতার বীজ। রাজা রামমোহন রায় যে উদার ধর্মীয় আলোকে বাংলার সমাজকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তা বঙ্কিমের মুসলিম নামধারী কিছু চরিত্র চিত্রণে বহুদিনের জন্য পশ্চাদমুখী হয়ে গেল।

তৃতীয় আর একটি আন্দোলন এ সময় বাংলায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল যাকে বলা যায় অসাম্প্রদায়িক জাতীয় আন্দোলন। এটা যে পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, তা নয়। বলা যায় এটা ছিল রাঙালির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রথম প্রয়াস। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দেয়া হাজারো অপমানের বিরুদ্ধে বাংলার শিক্ষিত সমাজই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, একথা ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, এটা ছিল অসম্মানের

বিরুদ্ধে অধীরতার কণ্ঠ— যে অসম্মান আমাদের ওপর সব সময় চাপিয়ে দিচ্ছিল এমন এক জাতি যারা প্রাচ্যদেশীয় নয়। বিশেষকরে এই সময়ে এই জাতির অভ্যাস ছিল মানুষের পৃথিবীকে সরাসরি ভাল এবং খারাপ এই দু'ভাগে ভাগ করা— যার ভিত্তি হল কোন গোলাধর্মে তার জন্য। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত তিনটি অন্দোলনের বাতাবরণে বেড়ে উঠেছিলেন। সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এ ধারণা অবশ্যই তখন ছিল না। নিভৃত পল্লী বিক্রমপুরে পাঠশালায় পাঠরত এক কিশোরের মনে বিজ্ঞান নিয়ে সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়নি। কিন্তু তবু বিজ্ঞানের আকর্ষণ তিনি অল্প বয়সেই অনুভব করেছিলেন। নয় বছর বয়সে তিনি এলেন কলকাতায় এবং ভর্তি হলেন প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে— যেখানে সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বেলজীয় পাদ্রি ফাদার ল্যাফে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখানোর তাঁর প্রচেষ্টাই যে বাঙালি তরুণদের বিজ্ঞানের দিকে প্রথম আকৃষ্ট করে তোলে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরের বছর তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য।

স্বাস্থ্যগত কারণে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে চিকিৎসাশাস্ত্র শেখা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র্যালো উৎসাহ দিলেন বিজ্ঞান পড়ার জন্য। তাই জগদীশচন্দ্র চিকিৎসাশাস্ত্র বাদ দিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন বিজ্ঞান শেখার জন্য। একশ' বছর পরে আজ কোন ছাত্র অর্ধকরী চিকিৎসাশাস্ত্র বাদ দিয়ে বিজ্ঞান পড়ছেন একথা চিন্তাই করা যায় না, কিন্তু সেদিন এটা সম্ভব ছিল। কেমব্রিজ থেকে জগদীশচন্দ্র বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন। বার বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তাকে ডি.এসসি. ডিগ্রি প্রদান করে সম্মানিত করে।

দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর জগদীশচন্দ্র বসু নিযুক্ত হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক হিসেবে। সেদিন থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে অবসর গ্রহণের দিনটি পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র এবং আরো অনেকে— যারা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অক্ষয় কীর্তি রেখে বাংলার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

প্রথমদিকে বসুর বেতন ছিল ইউরোপীয় অধ্যাপকদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ। একথা জানার পর বসু বেতন নিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু তিনি শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন, কেননা শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাছে একটা বিশেষ সম্মান। এক বছরের মধ্যেই সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং বকেয়াসহ পুরো বেতন দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

বিদেশী শাসকদের এই ধরনের আচরণ সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা দ্রুত মৌলিক গবেষণার দিকে আকৃষ্ট হল। বিজ্ঞান গবেষণায় সেদিন বোধ হয় জার্মানি সবার শীর্ষে ছিল। জগদীশচন্দ্র যে বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তার তিন বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় বার্লিনে বিখ্যাত গবেষণাগার রাষ্ট্রীয় ভৌত-প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র। এখানেই পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছিল। ঐ ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দেই বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্টস পরীক্ষাগারে প্রথম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করেন যা জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঠিক বাইশ বছর আগে তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অসাধারণত্ব বোধ হয় এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, হার্টসের আবিষ্কারের কিছু দিনের মধ্যেই সুদূর কলকাতায় বসে তিনি ঐ একই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং দ্রুত অভাবিত সাফল্য লাভ করেন। মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞান গবেষণার কোন ঐতিহ্য তখন ভারতে ছিল না। বিজ্ঞান গবেষণাগার বলতেও কলকাতায় তেমন কিছু ছিল না— যদিও কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী। চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার বহুদিন ধরে একটি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের চেষ্টা করে আসছিলেন। তিনি লিখছেন, ‘বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে প্রযুক্তিশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করে শিক্ষিত দেশপ্রেমিক ভদ্রলোকরা বৃথা শক্তি অপচয় করছেন।’ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, একশ’ বছর পরেও বর্তমান বাংলাদেশে এমন অনেকে আছেন যারা বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই ফলিত বিজ্ঞানের ওপর অহেতুক জোর দিয়ে ধুম্রজালের সৃষ্টি করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কয়েক দশক পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্য সবচেয়ে উত্তম বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থাও ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুযোগ-সুবিধার ধারেকাছেও পৌঁছত না। গত একশ’ বছরে পার্থক্যটা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞান প্রশাসকরা কোন দিনই একাডেমিক গবেষণার এই মৌলিক চরিত্র অনুধাবন করতে পারেননি যে, গবেষণায় তাত্ত্বিক এবং ফলিত উভয় কর্মকাণ্ডই সমান ভূমিকা পালন করে।

১৮৭০ সালের দিকে কলকাতার তিনটি প্রতিষ্ঠানে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হল মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের চিকিৎসাবিদ্যায় টেকনিশিয়ান তৈরি করা। বহুদিন ধরে ব্রিটিশ-ভারতে এই মেডিকেল কলেজটি ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে বিজ্ঞান পরীক্ষণের কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি প্রেসিডেন্সি কলেজ যেখানে জগদীশচন্দ্র বসু সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন।

তৃতীয় যে প্রতিষ্ঠানটির কথা বলতেই হয় তা হল জেসুইট পাদ্রিদের পরিচালিত কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাদানের জন্য এই কলেজের যে সুনাম ছিল তার মূলে ছিলেন ফাদার অয়জিন ল্যাফে। এই বেলজীয় পদার্থবিজ্ঞানী চল্লিশ বছর ধরে এই কলেজে শিক্ষাদান করেছেন এবং বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার

পথিকৃৎ হিসেবে নিঃসন্দেহে তাঁকেই চিহ্নিত করা চলে। ফাদার ল্যাফোর প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং ডেমনস্ট্রেশন কলকাতায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি তাঁর ছাত্র জগদীশচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'প্রিয় জগদীশ, আমি একটি উন্মুক্ত বক্তৃতা দিতে চাই যা হবে বেতার টেলিগ্রাফির ওপর। এই সুযোগে মার্কনির ওপর তোমার অধ্বাধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ নিতে চাই।'

ফাদার ল্যাফোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, যিনি ১৮৬৮ সালে ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন প্রকাশ করা শুরু করেন। তিন বছর পরে এই পত্রিকাতে তিনি 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এমন একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যেখানে তরুণ ভারতীয়রা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে পরবর্তী সাতাশ বছর তিনি এই এসোসিয়েশনের প্রবৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' ছিল আর একটি কেন্দ্র যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান এবং সত্যিকারের স্বনির্ভরতার মধ্যে যে একটা গভীর সংযোগ রয়েছে তা প্রথম স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে গভীর অনুরাগী হয়েও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের স্থবিরতাই হল ভারতের দাসত্বের প্রধান কারণ। জাতীয় পুনর্জাগরণের অবশ্যজ্ঞাবী অংশ হবে আধুনিক বিজ্ঞান— এই বিশ্বাসে তিনি ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করেন 'কলকাতা বিদ্যালয়' যেখানে ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। সাত বছর পরে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড এমহার্স্টের কাছে লিখেছেন, 'স্থানীয় জনগণের উন্নতি যেহেতু সরকারের কাম্য তাই সরকারের উচিত একটা উদারনৈতিক এবং আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা যার মধ্যে থাকবে গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান'।

আর একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল, যার পেছনে ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জির দূরদৃষ্টি এবং কর্মদক্ষতা। এককালের গণিতবিদ আশু মুখার্জি চাঁদা তুলে সৃষ্টি করলেন 'বিজ্ঞান কলেজ'— যা ছিল ভারতের প্রথম পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি জনসাধারণের অনুদানের মাধ্যমে যে প্রথম প্রফেসর পদের চেয়ার সৃষ্টি করেন—পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নে পালিত অধ্যাপকের চেয়ার— তারই প্রথম অধিকারী ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তুলনা করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৫ বছর পরেও আজ পর্যন্ত কোন পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠান ঢাকায় স্থাপিত হয়নি। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজই সৃষ্টি করেছে ভারতীয় বিজ্ঞানের পাঁচজন অবিস্মরণীয় নাম— জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহা।

এদের মধ্যে ব্যোজ্যোষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মরত অবস্থায় তিনি বেতারে বার্তা প্রেরণ করার এক ঘরোয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। আসলে এই দশ বছর বসু বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ উৎপাদন, গ্রাহকযন্ত্রে ধারণ এবং তার বিকিরণ গণাবলীর পরীক্ষণে ব্যাপ্ত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হাইনরিখ হার্টস যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ প্রথম সৃষ্টি করেন তার সাত বছরের মধ্যে সুদূর কলকাতায় বসে এ ধরনের পরীক্ষণে সম্পূর্ণ একাকী কাজ করে যাওয়া কম সাহসিকতা এবং মনোবলের পরিচয় দেয় না। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশেষকরে ৫ মিলিমিটার থেকে ১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করা। এই সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করার কাজে জগদীশচন্দ্র বসু নিঃসন্দেহে প্রথম এবং বিজ্ঞানীসমাজ আজ তাঁকে অকুণ্ঠভাবে এই সম্মান দিয়ে থাকে। তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছিল দ্বৈত প্রতিসরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সমবর্তনের ওপর পরীক্ষা। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের একটি সংখ্যায়। এক বছর পরে এই গবেষণাকে আরো প্রসারিত করে যে ফল পেয়েছিলেন তা তিনি লর্ড রায়লের মাধ্যমে রয়াল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। পরবর্তী কয়েক বছর বসু অর্ধপারবাহী বস্তুর এবং আলোক-পরিবাহকতার ওপর বিভিন্ন গবেষণা করেন।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার টাউন হলে একটি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি সর্বপ্রথম কঠিন দেয়ালের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের তারহীন প্রেরণ প্রমাণ করেন। এর ফলেই দ্রুত তাঁর নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরই ইংল্যান্ডের ইলেকট্রিশিয়ান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, বর্তমান সময়ে বেতারে বার্তা প্রেরণ করার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত যন্ত্র তাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বসুর ক্রমবর্ধমান খ্যাতির ফলে বাংলা সরকার নয় মাসের জন্য তাঁকে ইউরোপ ভ্রমণে পাঠান। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র বসু রয়াল ইন্সটিটিউশনের এক সভায় বেতারে বার্তা প্রেরণ প্রকাশ্যে দেখান। সভায় উপস্থিত ছিলেন লর্ড রয়ালে এবং আরো অনেকে। সুতরাং মার্কনির এক বছর আগেই যে তিনি বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন একথা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য। বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ সম্মান তিনি পাননি কিন্তু যা পেয়েছিলেন তার মূল্যও কম নয়। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে লেখেন,

বিজ্ঞান লক্ষীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে-

দূর সিদ্ধুতীরে

হে বন্ধু গিয়েছো তুমি জয়মাল্যখানি

সেখা হাতে আনি

দীনহীনা জননীর লজ্জানন্ত শিরে

পরায়েছ ধীরে।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পদার্থবিজ্ঞান যখন একদিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং অন্যদিকে প্রাণক-আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিকে মোড় ফিরছে তখন অজ্ঞাত কারণে জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণা শুরু করেন সম্পূর্ণ নতুন এক বিষয়ে। সেটিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিয়ে তিনি জৈব এবং অজৈব পদার্থে বিকিরণ-শোষণ প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা শুরু করলেন। এর পরের তিরিশ বছর ধরে তাঁর গবেষণা ছিল মূলত তুলনামূলক শরীরবিদ্যার ওপর, বিশেষকরে উদ্ভিদ শরীরবিদ্যার ওপর। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে এই বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফল নিয়ে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন যার নাম 'জীব এবং জড়ের সাড়া' (Response in the Living and Non-Living)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে, উদ্ভিদও বিদ্যুৎ প্রবাহের উত্তেজনা অনুভব করে এবং সাড়া দিয়ে থাকে। এর আগে ১৯০১ সালের ১০ মে তিনি রয়্যাল ইন্সটিটিউশনের শুক্রবারের সাক্ষ্য অধিবেশনে এ ব্যাপারে বক্তৃতা দেন। ৬ জুন তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভায় 'অজৈব বস্তুর বৈদ্যুতিক সাড়া' (Electric Response of Inorganic Substances)-এর ওপর বক্তৃতা দেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মার্চ তিনি লিনিয়ান সমিতিতে (Linnean Society) জীব-বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের এক সভায় 'যান্ত্রিক উত্তেজনার অধীনে সাধারণ উদ্ভিদে বৈদ্যুতিক সাড়া' (Electric Response In ordinary Plants under Mechanical Stimulus)—এই বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন। জগদীশচন্দ্র বসু যেসব উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তাঁর উক্ত পুস্তকে আছে, যেমন—

শিকড়— গাজর, মুলা

কাণ্ড— গাজর, মুলা

কাণ্ড— জেরানিয়াম ফুল, দ্রাক্ষালতা

পত্রবৃত্ত— বাদাম, শালগম, ফুলকপি, শাক, ইউকারিস লিলি

পুষ্পবৃত্ত— এরাম লিলি

ফল— বেগুন

এসবের বৈদ্যুতিক সাড়া মাপার জন্য তিনি স্বয়ং যেসব যন্ত্র তৈরি করেছিলেন সেগুলির কর্মক্ষমতা দেখলে এখনও প্রায় একশ' বছর পরেও আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। বিক্রমপুরের গ্রামের সেই মেধাবী ছেলেটির যন্ত্রপাতি তৈরি করার হাত যে অসাধারণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উদ্ভিদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কথাতেই বলা যায়— সুতরাং জীবনের সাড়া বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেমনভাবে দেখা যায় তা শুধু অজৈবের মধ্যে সাড়ার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখানে কোন রহস্য বা খোয়ালীপনা নেই যেমন একটা অযান্ত্রিক প্রাণশক্তি যা বস্তুর জগতে যেসব ভৌত আইন সক্রিয় তার বিপরীতে বা বিরুদ্ধে কাজ করে। আমরা দেখেছি যে, সাড়া সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাসগুলির জন্য প্রাণশক্তির অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই। আসলে এগুলি ভৌত রাসায়নিক প্রতিজ্ঞাস যা অন্য যে কোন অজৈব অঞ্চলের মতোই ভৌত অনুসন্ধানের মাধ্যমে বোঝা যায়।

প্রকৃতিকে বোঝার জন্য ভৌত আইনই যে যথেষ্ট, এর মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার নেই, প্রেরিত-জ্ঞানের যে কোন অবকাশ নেই একথা এমনি স্পষ্টভাবে জগদীশচন্দ্র

বসুর আগে বা পরে কেউ বলেছেন কিনা আমার জানা নেই। দুঃখের ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশে আজ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের নামে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ— যাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও রয়েছেন— তাঁরা ভৌত আইনই যাথেষ্ট, একথা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না।

দৃঢ়চেতা জগদীশচন্দ্র বসু কাউকে খুশি করার জন্য উদ্ভিদে প্রাণশক্তি বা Vital Force-এর প্রায়াজন মনে করেননি এটাই বাঙালির বিজ্ঞান-সংস্কৃতির ঐতিহ্য।

বাঙালি সংস্কৃতি— বিজ্ঞান যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসুর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের একটি দিক হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তিরিশ বছরের বন্ধুত্ব। জগদীশচন্দ্রের ওপর তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় পরিস্ফুট। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইয়রেজিতে অনুবাদের প্রেরণাও এসেছিল জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে যে ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন তার পেছনেও জগদীশচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণা সুস্পষ্ট। জগদীশচন্দ্র বসু নিজেও কবি ছিলেন এবং তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘ভাগরথীর উৎস সন্ধান’ে কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য ছিল। সেই প্রবন্ধটির ভাষার স্বচ্ছতার আভাও আমাদের কানে বাজে, ‘কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত/ গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্জটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গে আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্কর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূম্রাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে।’

সত্যেন বসু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন, ‘আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যারা এই মহান শিক্ষকের পদতলে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন আমি তাঁদের একজন। তখনকার তীব্র আনন্দের উত্তেজনা এখনও আমার অনুভবে আসে, যখন মনে হয় তিনি কি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর ক্লাসে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে তাঁর অসাধারণ আবক্ষিগুলির কথা বলতেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল বিজ্ঞানে নিষ্ঠার এক প্রোচ্ছল উদাহরণ। আমাদের সময়কার অনেক ছাত্র স্বেচ্ছায় বিজ্ঞানকে তাঁদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়ে যখন এধরণের গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এই ঘটনার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল বাংলায় গবেষণার মহান পথিকৃৎদের অনুপ্রেরণাদায়ী উদাহরণ— স্যার জে.সি. ঘোষ এবং স্যার পি.সি. রায়। তাঁদের স্মৃতি চিরজীবী হোক এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রজন্মকে অব্যাহত অনুপ্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করুক।’

বাঙালি রেনেসাঁর অন্যতম স্রষ্টা বাঙালি বিজ্ঞান-সংস্কৃতির অন্যতম জনক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু এই উপমহাদেশের প্রথম সার্থক বিজ্ঞানী। তিনি বিক্রমপুরের সন্তান এটাই আমাদের আনন্দ দেয় না চেয়ে বেশি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পথিকৃৎ রসায়নবিজ্ঞানী

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, বছরটি রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে অরণীয়, কেননা ঐ বছর বিজ্ঞানী ফ্রুকস থলিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। আরেকটি কারণেও ১৮৬১ সাল প্রতিটি বাঙালির কাছে অরণীয়, কেননা ঐ বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেমন বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে আধুনিক ধারণা প্রকাশের বাহন করে পৃথিবীর সামনে গৌরবের আসনে বসিয়েছিলেন।

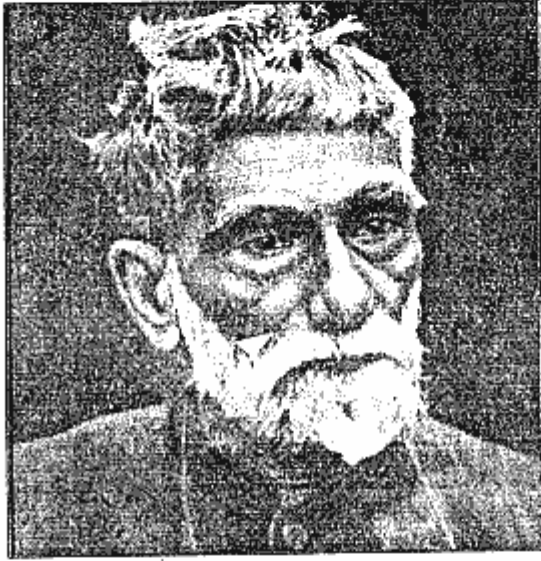
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান ছিল রাড়ুলি গ্রামে। এক সময়ে তা বাংলাদেশের যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে তা খুলনা জেলার মধ্যে আসে। কপোতাক্ষ নদীর তীরে ঐ গ্রাম। ঐ একই নদীর তীরে আর একটি বিখ্যাত গ্রাম সাগড়াদাড়ি, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রষ্ঠা বাংলার প্রথম মহাকাব্যের কবি মধুসূদন দত্ত।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় মৌলভী সাহেব নিযুক্ত করে খুব ভালভাবে ফার্সি শিখেছিলেন এবং তিনি কিছু আরবীও জানতেন। হরিশ্চন্দ্র অনেক সময় বলতেন যে, যদিও তিনি এক গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবু তাঁর মন-মানস তৈরি হয়েছে হাফিজের ‘দিওয়ান’ দিয়ে। শোনা যায় হরিশ্চন্দ্র লুকিয়ে মুরগির মাংসের আবাদও গ্রহণ করেছিলেন। পিতার কাছ থেকে প্রফুল্লচন্দ্র যে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলেন তাই তাঁর সারাজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার শেরবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, এমনুযটি মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আগাগোড়া বাঙালি। প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ এবং নির্ভেজাল বাঙালি। ইতিহাসের পাতায় যে কয়েকজন মানুষ অনন্তকাল ধরে ‘বাঙালি’ এই শব্দের প্রতিভূ হয়ে থাকবেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন।

আবহমান কালের হিন্দু-মুসলিম যৌথ সংস্কৃতির ফসল প্রফুল্লচন্দ্র রায়। চৌদ্দ, পনের এবং ষোড়শ শতকের মুসলমান পীরগণ ইসলামের বাণী নিয়ে দক্ষিণ বাংলার নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এদের একজন ছিলেন খাজা আলী— যিনি ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাটের কাছে ঘাটগুজ মসজিদটি স্থাপন করেছিলেন। রাড়ুলি গ্রামের কাছে আরো একটি মসজিদ তিনিই স্থাপন করেছিলেন, একথা শুদ্ধার সঙ্গে আত্মজীবনীতে প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বপুরুষরা জাহাঙ্গীরের সময় সন্ন্যাসের কাছ থেকে কয়েকটি গ্রামের দান পেয়ে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে এসেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তাঁর প্রপিতামহ

মানিকলাল রায় নদীয়া-যশোরের কালেক্টরের দেওয়ান হয়েছিলেন। দেওয়ান হিসেবে তাঁর আয় ছিল প্রচুর, কেননা শোনা যায় যে, তাঁর কর্মস্থল কৃষ্ণনগর থেকে মাটির হাঁড়ি ভর্তি করে কোম্পানির সিক্কারপাি অর্থাৎ টাকা গ্রামের বাড়িতে আনা হত। অবশ্য ডাকাতদের চোখে খুলা দেয়ার জন্য হাঁড়ির ওপরে বাতাস। দেয়া থাকত, লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র।



পিতামহ আনন্দলাল রায় যশোরের সেরেস্তাদার হিসেবে আরো সম্পত্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজি শিখতে পাঠিয়েছিলেন ১৮৩৬ সালে। এখানেই হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত শিক্ষক রামতনু নাহিড়ীর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু আনন্দলাল রায়ের হঠাৎ মৃত্যু হলে তাঁকে লেখাপড়া শেষ না করেই গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়।

পঁচিশ বছর বয়সে হরিশ্চন্দ্র রায় তাঁদের সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি যে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উদার সংস্কৃতির মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায় এই ব্যাপার থেকে যে, তিনি ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন তা বটেই, ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান কম ছিল না। বেকনের 'নোতান অরগ্যানাম' তিনি পুত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তিনি কলকাতার শিক্ষিত সমাজে যাতায়াত করতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি ওগুদ রোথে বেহালা বাজানো শিখেছিলেন। ইয়ং বেসনের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হরিশ্চন্দ্র শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাড্‌ক্লিফে গ্রামে তাঁর চেষ্টাতেই একটি মিডল ইংলিশ স্কুল এবং একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর জমিদারী খুব বড় ছিল না— বছরে আয় হয়তো ছয় হাজার টাকার

বেশি হত না। কিন্তু তবু এ আয় থেকেই তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর দুই বড় ভাই গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া শুরু করেন।

১৮৭০ সালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম কলকাতা আসেন এবং তিনি লিখেছেন যে, ঐ সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা প্রথম চালু হলেও গোড়া হিন্দুরা কলের পানি পান করতে চাইত না। অবশ্য ধীরে ধীরে অন্তত এ ব্যাপারে তাদের কুসংস্কার চলে যায়। সুয়েজ খাল এ সময়ে খোলা হলে লন্ডন, লিভারপুল, গ্লাসগো কলকাতার কাছে চলে আসে এবং কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বহুত্বে বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধের বিষয় কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য এ সময় থেকেই ধীরে ধীরে মাড়োয়ারিদের হাতে চলে যায়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন, 'একটি স্বর্ণসুযোগ যা একবারই কোন জাতির জীবনে আসে তাকে ছিনিয়ে নিতে দেয়া হল। বাংলা তার সুযোগ চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলল।' বলাই বাহুল্য মাড়োয়ারি-ইম্পাহানিদের হাতে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী এ সময় থেকেই আটকা পড়ে যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর বড় ভাই প্রথমে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সহপাঠীরা 'বাদাল' বলে ফেপাত এবং একশ'-দেড়শ' বছর পরেও কলকাতার অধিবাসীদের এ ব্যাপারে মানসিকতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যে, তিনি এই সব অলস বাক্যবাণীশদের প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়ের সামরিক কৃতিত্বের কথা অথবা বাংলার মিল্টন মধুসূদন দত্ত, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কথা বলেও থামাতে পারতেন না।

স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস ও ভূগোল এবং এই দুই বিষয়েই তিনি পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেতেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়েও তিনি এ সময় প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। বিশেষকরে মনীষীদের জীবনী তাঁকে আকর্ষণ করত সবচেয়ে বেশি। নিউটন, গ্যালিলিও'র জীবনী এ সময়েই তিনি পড়েছিলেন।

দুগ্ধের বিষয় ১৯৭৪ সালে যখন তাঁর বয়স তের তখন তাঁকে প্রচণ্ড রকমের রক্ত আমাশয় রোগে আক্রমণ করে। এই রোগের কবল থেকে তিনি সারাজীবনেও বোধ হয় সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেননি।

স্কুল পরিত্যাগ করে তাই তাঁকে ঘরে বসেই লেখাপড়া করতে হত। অবশ্য একদিক দিয়ে এতে তাঁর ভালই হয়েছিল, কেননা স্কুলের বাঁধাধরা রুটিনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি ইচ্ছামতো পড়াশোনা করতে পারতেন। এই সময়েই তিনি নিজে নিজেই ল্যাটিন শেখা শুরু করে দেন এবং কিছুটা ল্যাটিন রপ্ত করার ফলে কারো সাহায্য ছাড়া ফরাসি ভাষা শেখাও তাঁর পক্ষে আর কষ্টকর হল না। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের আকর্ষণই তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে বেশি এবং তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তিনি ভালভাবেই পরিচিত হয়েছিলেন।

স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল হওয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র এলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে সব শিক্ষকই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। সেই যুগে এই সব সমাজ-সংস্কার করা কিভাবে হিন্দুদের হাতে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন আজকাল তা চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু হাসিমুখে তাঁরা সব কিছুই সহ্য করে যেতেন।

নবার্ট স্কুলের এইসব শিক্ষকদের কাছে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম থেকেই ধরা
ডুছিল, তাই তিনি আবার হেয়ার স্কুলে ফিরে যেতে চাইলেও ঐ শিক্ষকরাই তাঁকে ফিরে
তে দেননি। তাঁর শিক্ষক আদিত্য কুমার চ্যাটার্জির কথা তিনি লিখেছেন, 'আমি আমার
খবর সামনে যখন তাঁর হাসিভরা মুখটি দেখি যেন তাঁর সমস্ত অবয়ব থেকে একটা
বস্ত্র প্রভা বিকীর্ণ হত।'

এই সময়েই রুশ-তুর্কি যুদ্ধ শুরু হয় এবং ওসমান পাশা ও আহমেদ মুখতার পাশা
অতুলনীয় সাহসের সঙ্গে তাঁদের দেশ রক্ষা করেছিলেন তা কিশোর প্রফুল্লচন্দ্রের মনে
গীর রেখাপাত করে। তিনি লিখেছেন, 'বলাই বাহুল্য আমার সব সহানুভূতি ছিল
কিঁদের দিকে।'

এলবার্ট স্কুল থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষকরা যেরকম
শাস্তি করেছিলেন সেরকম ফল তিনি করতে পারেননি যে কোন কারণেই হোক। কিন্তু
রাজ্য তিনি নিজে বিশেষ হতাশ হননি। এরপর তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
ট্রোপনিটান ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন, কেননা প্রথমত এটি ছিল একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ভারতীয়রা নিজেরা গড়ে তুলেছে এবং দ্বিতীয়ত এখানে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন
রেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাঁকে সকলে প্রায় দেবতার মতো ভক্তি করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য
ইংরেজি ছাড়াও প্রথম আর্টস পরীক্ষায় 'নায়নশাস্ত্র এবং ব্যাচেলর অব আর্টস পরীক্ষার জন্য
নায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বিষয় দুটি তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে
হিরাগত ছাত্র হিসাবে পড়তে হত এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন আলেকজান্ডার
পডলার (পরবর্তীকালে স্যার) যিনি তাঁকে রসায়নে পরীক্ষণের দিকে আকৃষ্ট করে
ছিলেন।

এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষার জন্য
গোপনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য
শেষে চেষ্টা করেছিলাম কেননা ব্যর্থ হলে আমার সহপাঠীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের সম্মুখীন
তে হবে জানতাম।' কিন্তু তবু এটা গোপন থাকল না এবং স্কুলের পরীক্ষায় ভাল করা
কাজন ছাত্র বলেই ফেললেন যে, প্রফুল্লচন্দ্রের নাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেভারের
এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। কিন্তু স্টেটসম্যান পত্রিকায় সত্যিই যেদিন সংবাদ
বরুল যে, তিনি এই গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়েছেন সেদিন তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি
শাশ্বত হয়েছিলেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম বি.এসসি. পরীক্ষার জন্য ভর্তি হন। তাঁর
বয়স ছিল রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যা অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন
যে, রসায়ন তাঁর আসল আকর্ষণ। রসায়নে তাঁর শিক্ষক ছিলেন আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউন
(পরবর্তীকালে স্যার)। ক্রাম ব্রাউনের জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। তিনি গণিতের সমস্যা
নিয়েও চিন্তা করতেন এবং এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁর অবদান ছিল। জৈবরসায়ন শাস্ত্রে
তাঁর গ্রাফিক ফর্মুলাপদ্ধতি এই বিষয়ের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।
প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন, 'সাতচল্লিশ বছর পরেও যে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তখন আমি
প্রাণের প্রিয় বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি তা স্মরণ করতে পারি।'

এই সময় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেটর 'বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারত' এই বিষয়ের ওপর এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেন। বহু পরিশ্রম করে প্রফুল্লচন্দ্র একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যার জন্য তাঁকে রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়েও কিছুদিন বেশ পড়াশোনা করতে হয়েছিল। পুরস্কার তিনি অবশ্য পাননি কিন্তু তাঁর প্রবন্ধকে পুরস্কারের যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। পরে তিনি জেনিছিলেন যে, পরীক্ষকরা মন্তব্য করেছিলেন, 'আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগে ভরা' প্রফুল্লচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি পরে 'এসে অন ইন্ডিয়া' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং উদারনৈতিক ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র তার প্রশংসা করেছিল।

যথাসময়ে প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নশাস্ত্রে তাঁর গবেষণা সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করেন এবং তাঁকে ডি.এসসি. ডিগ্রি দেয়া হয়। 'অবশ্যই আমি জানতাম যে, আমি ডিগ্রি পাবই', তিনি লিখেছেন। তার পরেও আরো শেখার জন্য আরো এক বছর তিনি এডিনবরায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তাঁকে হোপ পুরস্কার বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন সমিতির সহ সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন (সভাপতি ছিলেন ক্রাম ব্রাউন)।

১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক ছ'বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। বাংলার শিক্ষা বিভাগে রসায়নে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্যে তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু কোনই লাভ হয়নি। প্রায় এক বছর তাঁর কোন চাকরি ছিল না এবং জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহে তিনি অতিথি হিসেবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'আমার মতো যোগ্যতার একজন ব্রিটিশ রসায়নবিদকে আমদানি করলে ভারত-সচিব তাঁকে অবিলম্বে ভ্রমণভাতাসহ ইম্পেরিয়াল সার্ভিসে যোগদান করতে দিতেন।'

শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্রিটিশ সরকার মাসিক আড়াইশ' টাকা বেতনের একটি পদে নিয়োগদান করেন, যা অবশ্য পরে ভারত-সচিবের অনুমতিক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা হবে বলা হয়েছিল। ব্রিটিশ-ভারতে বিজ্ঞানী হওয়ার মাশুল এভাবে দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন।

ধীরে ধীরে শিক্ষকতার সঙ্গে তিনি গবেষণার কাজও শুরু করেন। ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে তাঁরই দেয়া নকশায় প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন রসায়নবিজ্ঞান ভবন তৈরি হয় এবং এখানেই প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'পারদের ওপর শীতল অবস্থায় ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড দিয়ে মারকিউরাস নাইট্রেট বেশি করে তৈরি করার সময় একটা হলুদ কেলাসিত বস্তুর উদ্ভব দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে এটা একটা বেসিক সল্ট বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু জোরালো এসিড দ্রবণে এ ধরনের লবণের উদ্ভব সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। প্রাথমিক পরীক্ষার প্রমাণিত হল যে এটি একটি মারকিউরাস সল্ট এবং নাইট্রেটও। সুতরাং এই উল্লেখযোগ্য যৌগটি নিয়ে গবেষণা করলে ভালই ফল পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হল।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এ ধারণা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কালক্রমে তিনি ইন্সটিটিউটসমূহের ওপর একজন স্বীকৃত অথরিটি হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর গবেষণার নাই নাইট্রাইট যৌগ যে অস্থিতিশীল বস্তু নয় তা রসায়নবিদ্যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সময়েই তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসি রসায়নবিদ এম. বেরথেলের যোগাযোগ হয় এবং ভারতীয় রসায়নের ব্যাপারে তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনের আর একটি মনুমেন্টাল কাজ 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমস্ত পৃথিবীর বিদ্বান সমাজ তার ভূয়সী প্রশংসা করে। ১৯১২ সালে গরহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সাম্মানিক ডি.এস.সি. ডিগ্রি প্রদান করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন যে, তাঁর খ্যাতি প্রধানত এই গ্রন্থের মাধ্যমেই, কেননা এটি বিষয়ের ওপর চূড়ান্ত গবেষণামূলক অবদান।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই গ্রন্থ যখন তিনি রচনা করছিলেন তখনই তিনি তাঁর জীবনের আর একটি বিখ্যাত কাজ 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' শুরু করেন। ইউরোপে থাকার সময়েই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানে শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্পের বিপুল ঐতিহ্য ইতিহাস আসলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপারগুলিরই বিজয়ের ইতিহাস। কিন্তু বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কিছুমাত্র উদ্যোগও দেখা যায় না। এই চিন্তা থেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রথমে সালফিউরিক এসিড তৈরি করার চিন্তা করেন, কেননা এই এসিডটি হল 'শিল্পের জননী'। এরপর কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। দেশী জিনিস প্রথম দিকে বিক্রি করাও কষ্টকর ছিল এবং প্রথম বেদিন তিনি সিরাপ ফো'র আয়োডাইডের অর্ডার পেয়েছিলেন সেদিন তিনি লিখেছেন যে, তাঁর আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কলেজের শিক্ষকতা এবং গবেষণার কাজ শেষ করে প্রতিদিন বিক্রেলে তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালে এসে কাজ শুরু করতেন। 'সৌভাগ্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের কাজেই ছিল আমার আনন্দ', লিখেছেন তিনি। এর ফলেই বেঙ্গল কেমিক্যাল সে যুগে বাংলার নবীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হয়ে উঠেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র কারখানা বাংলার শিল্পায়নে অভুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলাবাহুল্য।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (স্যার পি. সি. রে) জীবনের অধিক সময় তাঁর ল্যাবরেটরির একটি ঘরে চিরকুমারের জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, পুরস্কার কিছুই ওপর তাঁর কোন লোভ ছিল না। খন্দর পড়তেন, একটা সাধারণ কোট আর খাটো করে পড়া ধুতি এই ছিল তাঁর বেশাবাস। এই সৌম্যকান্তি ঋষি সব বাঙালির সামনে যে তাগেণের আদর্শ ভূলে ধরেছিলেন তার কোন তুলনা নেই। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে বিজ্ঞান কলেজেই তাঁর মহাপ্রয়াগ ঘটে।

রামানুজন, একটি প্রহেলিকা ও একটি বেদনাময় স্মৃতি

কখনও কখনও মানুষের ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় যা সাধারণ কোন নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউটন বা আইনস্টাইন-এর আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি যুগান্তকারী। গণিতের ইতিহাসেও রামানুজনের আবির্ভাব এবং বিরোধান ধূমকেতুর মতো। গণিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাহীন এই তরুণ কিভাবে বছর পাঁচেকের সত্যিকার কর্মজীবনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পবেষণায় অভুলনীয় মেধার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা কোন যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাঁর জীবন একটি সর্বকালের প্রহেলিকা।

রামানুজন একজন দরিদ্র ভারতীয়, যাকে অর্ধশিক্ষিত বললে তাঁর প্রতি অসম্মান করা হয় না বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ করা হয়। তিনি কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম আর্টস বা এফ. এ. পরীক্ষাও পাস করেননি। এমনকি তিনি 'অকৃতকার্য বি.এ.' তাও বলা যায় না। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি আধুনিক ইউরোপীয় গণিত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিরিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান যখন এক অর্থে তাঁর গণিত শিক্ষা সবে শুরু হয়েছিল। তবু গণিতে তাঁর প্রকাশনা দিয়ে চারশ' পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির পরিমাণও বিপুল, যা অতি সম্প্রতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কাজের মধ্যে অনেক কিছু সম্পূর্ণ নতুন, অনেক কিছু যা অন্যের জানা থাকলেও তিনি নিজে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। কখনও কখনও তাঁর আবিষ্কার অসম্পূর্ণ এবং এখনও ঠিক বোঝা যায় না যে, কোন কোন ব্যাপারে তিনি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন এবং কোন কোন জিনিস তিনি যে কোন ভাবেই হোক শিখেছিলেন। রামানুজন কত বড় মাপের গণিতবিদ ছিলেন তা যেমন পরিমাপ করা যায় না তেমনি কত বড় গণিতবিদ তিনি হতে পারতেন তাও বলা অসম্ভব।

রামানুজনের ব্যাপারে এই অসুবিধা, তাঁকে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই ব্রিটিশ গণিতবিদ জি.এইচ. হার্ডিও অনুভব করেছেন। হার্ডি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম রামানুজনের কাজ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সে কাজের মূল্য তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। রামানুজনের বিশাল কাজের কোন কোন অংশের ওপর অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ওয়াটসন এবং অধ্যাপক মরডেল। কিন্তু তাঁরা কেউই রামানুজনের ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। হার্ডি তাঁর সঙ্গে কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন এবং প্রায় প্রত্যেক দিন দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। হার্ডি লিখেছেন যে, রামানুজনের সঙ্গে জড়িত হওয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক ঘটনা এবং পৃথিবীর সবার চাইতে রামানুজনের কাছেই তাঁর স্বপ্ন সবচাইতে বেশি।

১৮৮৭ সালে রামানুজন কুষ্কোনামের কাছে এরোদ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় এই গ্রাম। তাঁর পিতা ছিলেন কুষ্কোনামের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী দোকান-কর্মচারী। তাঁর সব আত্মীয় উচ্চবর্ণের হলেও তাঁর অত্যন্ত গরিব ছিলেন।



সাত বছর বয়সে রামানুজন কুষ্কোনামের হাইস্কুলে পড়তে যান। দশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার কথা সকলে জানতে পারেন এবং তাঁর এ সময়কার জীবন সহস্রাে তাঁর জীবনীকাররা কিছু অদ্ভুত গল্প বলেন। তাঁরা বলেন যে, গণিতের ট্রিগোনোমেট্রি পড়তে শুরু করে তিনি নিজেই অয়লারের সাইন ও কোসাইন উপপাদ্য (ডি-ময়ভার উপপাদ্য নামেও যা পরিচিত) আবিষ্কার করেছিলেন। পরে তিনি লোনির ট্রিগোনোমেট্রি বই থেকে বুঝলেন যে, এই উপপাদ্য আগেই জানা এবং তা তাঁকে বেশ হতাশ করেছিল। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তিনি উচ্চ পর্যায়ের কোন গণিতের বই দেখেননি। হুইটেকারের ‘মর্ভান এনালিসিস’ তখনও লেখা হয়নি। তিনি এই সব বই পেলে কথ ভাব হত তা কেবল কল্পনাই করা চলে। যে বইটি তিনি পেয়েছিলেন তার নাম ছিল ‘সিনোপসিস’, লেখক জনৈক জর্জ কার।

কার ছিলেন কেমব্রিজের একজন ছাত্র। তাঁর ‘সিনোপসিস’ এখন আর পাওয়া যায় না। কুষ্কোনাম সরকারি কলেজের গ্রন্থাগারে এই বইটি ছিল এবং রামানুজনের এক বন্ধু তাঁকে এই বইটি পড়তে দেন। বইটি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু রামানুজনের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে এই বইটি সর্বকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। কার আসলে প্রাইভেট কোচিং দিতেন এবং বইটি তাঁর কোচিং ক্লাসের জন্যই লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। এই বই-এ ৬১৬টি উপপাদ্যের উল্লেখ আছে যা সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। কারের বইতে উপপাদ্যগুলির প্রমাণ সেরকম বিস্তৃতভাবে নেই এবং পরবর্তীকালে রামানুজনের

বিস্মৃত নোটবইতেও ঠিক একইভাবে কোন প্রমাণ ছাড়াই তাঁর আবিষ্কৃত উপপাদ্যগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রামানুজনের মতো একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বালকের অনুপ্রেরণার জন্য কারের বইটি খুব খারাপ ছিল না এবং রামানুজনের তাত্ত্বনিক তৎপরতাও ছিল বিস্ময়কর। তাঁর জীবনীকাররা লিখেছেন যে, এইভাবে তাঁর সামনে যে নতুন জগৎ উন্মোচিত হল সেখানে তিনি আনন্দের সঙ্গে বিচরণ শুরু করলেন। আর কোন বই-এর সাহায্য যেহেতু তিনি পাননি তাই প্রত্যেকটি সমাধান ছিল তাঁর এক একটি গবেষণার ফল। রামানুজন বলতেন যে, নামাক্কলের দেবী তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে ফর্মুলা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, অনেক সময় ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কিছু গণিতের ফর্মুলা লিখে ফেলতেন এবং ভাড়াভাড়ি তা প্রমাণ করতেন, যদিও অনেক সময় তিনি সুচারু প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই দিতে পারেননি।

রামানুজন যে ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া ছিলেন তা কিন্তু মোটেই নয়, যদিও তিনি ন্যমাস্কলের দেবীকে তাঁর প্রেরণার উৎস বলেছেন। তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুর পক্ষে যা কিছু করণীয় তা অবশ্যই পালন করতেন। এমনকি ইংল্যান্ডেও তিনি তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য থেকে এক চুল বিচ্যুত হননি। কেননা তিনি পিতা-মাতাকে এভাবেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের মতো শীতের দেশে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর শুধু নিরামিষ খেয়ে জীবনধারণ তাঁর পক্ষে আরো কষ্টকর হয়েছিল। তিনি নিজেই রান্না করতেন এবং ঠাণ্ডা যতই লাগুক রান্নার আগে অবশ্যই কাপড় বদলে পাজামা পরে নিতেন। কিন্তু এসবই ছিল ধর্মের প্রতি তাঁর সরল আনুগত্যের পরিচয়, কোন বুদ্ধিবৃত্তিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফল নয়। হার্ভি লিখেছেন যে, একবার তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন রামানুজনের মুখে একথা শুনে যে, সব ধর্মই তাঁর কাছে মোটামুটি একই মনে হয়— একথা তিনি অন্তর দিয়ে না বিশ্বাস করলে নিশ্চয়ই বলতেন না। কেউ যদি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তবে সে কথার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তবে অবশ্যই তাঁর কথা তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তিনি বিশ্বাস করলে কেন সে কথা বলবেন। তাই রামানুজনের মতো একজন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি বলেন যে, তাঁর কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস নেই তবে অবশ্যই বলতে হয় যে, তিনি তাঁর অন্তরের কথাই বলেছেন।

হার্ভিকে রামানুজন একথা বললেও তিনি কখনও তাঁর পিতা-মাতা বা ভারতীয় বন্ধুদের এ ধরনের কথা বলতেন না। তিনি হার্ভির কথামতো একজন সত্যিকারের এগনস্টিক ছিলেন, যার কাছে হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন ভাল বা খারাপ দিক বলে কিছুই ছিল না। হিন্দুধর্ম হল আচার-আচরণের ধর্ম, যেখানে বিশ্বাসের স্থান ততটা নয় যতটা খ্রিস্টধর্মে রয়েছে। তাই রামানুজনের জীবনীকাররা যদি মনে করেন যে, তাঁর নামাক্কলের দেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল তবে ভায়া যে খুব অন্যায় করেন তাও নয়। তিনি ধর্মের সব কিছুর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

রামানুজনের ধর্মবিশ্বাস সহজে একথা বলা দরকার এজন্যই যে, তাঁকে নিয়ে যে রহস্যের মর্যাজাল সৃষ্টি করা হয় তার কোন ভিত্তি নেই। হার্ভি লিখেছেন যে, 'রামানুজন যখন কেমব্রিজে বাস করতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল তখন তিনি অন্য দশ জনের মতোই যুক্তি মেনে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীর-স্থিরভাবে চলতেন এবং বিষয়-বুদ্ধিও তাঁর আর সকলের মতোই ছিল। তাঁকে প্রাচ্যের অবিশ্বস্ত জ্ঞানের রহস্যময় দুর্যোধ প্রকাশ এটা ভাবার কোনই কারণ নেই, কেননা আরো অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির মতোই তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বসে এক কাপ চা পান করা যেত এবং রাজনীতি ও গণিত নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আলাপ করা যেত। তিনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন এবং একজন বড় মাপের গণিতবিদও ছিলেন এটাই আসল কথা।'

সতের বছর বয়স পর্যন্ত রামানুজনের জীবন ভালই কাটল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন এবং জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকোণামের সরকারি কলেজে ফার্স্ট আর্টস শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ইংরেজি এবং গণিতের ব্যুৎপত্তির জন্য সুব্রাহ্মনিয়ান বৃত্তি লাভ করেন।

কিন্তু এর পরেই তাঁর জীবনে কয়েকটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। এ সময়ে তিনি গণিত নিয়ে এতই আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন যে ইংরেজি, ইতিহাস, শারীরবিদ্যা যে কোন বিষয়ের ক্লাসে তিনি গণিতের কোন গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ক্লাসে কি পড়েনো হচ্ছে তার দিকে কোন খেয়াল করতেন না। গণিতের প্রতি অসাধারণ ঝোঁক এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অবহেলার ফলে তিনি পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন পেলেন না এবং ফলে তাঁর বৃত্তিও বাতিল হয়ে গেল। এ সময়ে হতাশ হয়ে কিছুদিনের জন্য তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ফিরে এসে আবার কলেজে যোগ দিলেন। যথেষ্ট হাজিরা না থাকায় ১৯০৫ সালে তিনি টার্ম সার্টিফিকেট পেলেন না। ১৯০৬ সালে তিনি মদ্রাজের পাচাইরাপ্পা কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অসুস্থ হয়ে আবার তিনি কৃষ্ণকোণামে ফিরে আসেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে অবতীর্ণ হন এবং পাস করতে ব্যর্থ হন।

১৯১২ সাল পর্যন্ত রামানুজনের কোন নির্দিষ্ট কাজ ছিল না— অবশ্য গণিত ছাড়া। ১৯০৯ সালে তিনি বিবাহিত হন এবং তাই তাঁর একটি নিয়মিত চাকরির প্রয়োজন হল। কিন্তু তাঁর কলেজ জীবনের ব্যর্থতার জন্য চাকরি পাওয়াও মুশকিল ছিল। রামস্বামী আয়ারের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তিও তাঁর জন্য সেরকম কিছু করতে পারলেন না। ১৯১২ সালে তিনি মদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে একটি কেরানীর চাকরি লাভ করেন। এসময় তাঁর বয়স পঁচিশ এবং আর পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। আঠার থেকে পঁচিশ বছর যে কোন মানুষের জীবনে শিববার সবচেয়ে ভাল সময়। এই সময়টাই রামানুজনের সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তবু ১৯১১ সালে রামানুজনের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং পনের বছর থেকে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা সকলের চোখে পড়তে থাকে। এটা স্বীকার করেই হবে যে, ইংরেজরাই তাঁর জন্য এসময় সত্যিকারের সাহায্যের কাজ কিছু করেছিলেন।

স্যার ফ্রান্সিস প্রিং এবং স্যার গিলবার্ট ওয়াকার তাঁর জন্য বার্ষিক ষাট পাউন্ডের একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন, যা দিয়ে তিনি সস্ত্রীক মোটামুটিভাবে জীবনধারণ করতে পারতেন।

১৯১৩ সালের প্রথমে রামানুজন কেমব্রিজের অধ্যাপক জি.এইচ. হার্ডিকে তাঁর কাজ উল্লেখ করে পত্র দিয়েছিলেন এবং হার্ডি ও অধ্যাপক নেভিল বহু অসুবিধা পেরিয়ে ১৯১৪ সালে রামানুজনকে কেমব্রিজে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি তিন বছর অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুখ থেকে তিনি সত্যিকারভাবে আর কোন দিনই ভাল হতে পারেননি। এর পরেও তিনি কাজ করে গিয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতার যে হানি হয়েছিল তাও নয়। তাই ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু আকস্মিকই বলতে হয়।

১৯১৮ সালে রামানুজন রয়াল সোসাইটির ফেলো এবং একই বছরে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। এই দুই সমিতিরই তিনি প্রথম ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য। মৃত্যুর দু'মাস আগে তিনি খিটা অপেক্ষক নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

রামানুজনের কাজের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন মত থাকতে পারে, তাঁকে কোন মানে বিচার করা যাবে এবং ভবিষ্যতের গণিতের ওপর তাঁর প্রভাবইবা কতটুকু এসব কিছু নিয়েই অনন্তকাল ধরে আলোচনা চলতে পারে। হয়তো বড় মাপের কাজের সারল্য এবং অবশ্যগ্ৰাবিতা তাঁর কাজে ছিল না, হয়তো তাঁর কাজ এত অদ্ভুত না হলে তা আরো বড় মাপের হত। কিন্তু তাঁর একটা গুণের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না— তা হল তাঁর গভীর এবং দূর্ভেদ্য মৌলিকত্ব। তরুণ বয়সে তাঁকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারলে হয়তো তিনি আরো বড় গণিতবিদ হতে পারতেন, অনেক কিছু নতুন এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও তিনি হয়তো আবিষ্কার করতে পারতেন, কিন্তু তা হয়নি। কুহকনামের সরকারি কলেজ তার মতো একমাত্র প্রতিভাবান ছাত্র পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি। উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার এরচেয়ে বড় উদাহরণ বোধ হয় আর নেই।

হার্ডির কাছে লেখা রামানুজনের চিঠিতে ১২০টি উপপাদ্যের উল্লেখ ছিল যা তাঁর নোটবই থেকে ভুলে দেয়া হয়েছিল। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ভারতীয় কর্মচারীর কাছ থেকে এ ধরনের চিঠি পেয়ে হার্ডির কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা শুধু কল্পনাই করা যায়। এই ১২০টি উপপাদ্যের কোন কোনটি হার্ডির কাছে পরিচিত মনে হয়েছিল। কোন কোন ফর্মুলা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, রামানুজনের কাছে এ ধরনের আরো ফর্মুলা নিশ্চয়ই আছে। তবে সবগুলি স্বত্বকেই তাঁর একথাই মনে হয়েছিল যে, একজন অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের গণিতজ্ঞের পক্ষেই এইসব ফর্মুলা লেখা সম্ভব। রামানুজনের ভারতে থাকাকালীন কালের দুই-তৃতীয়াংশই পুনরাবিষ্কার এবং তাঁর জীবদ্দশায় এর বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়নি। প্রফেসর ওয়াটসন রামানুজনের নোটবই অনুসন্ধান করে আরো উল্লেখযোগ্য ফর্মুলা পেয়েছেন। রামানুজনের প্রকাশিত কাজের বেশির ভাগই কেমব্রিজে থাকাকালে করা। তিনি প্রচলিত অর্থে গণিতবিদ কোন দিনই হতে পারেননি। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন

করতে তাঁর দেহ হত না। উপপাদ্যের 'প্রমাণ' বলতে কি বুঝায় তা তিনি পরবর্তীকালে বুঝতে পারতেন, যদিও তাঁর কাজের পদ্ধতি আগের মতোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং স্বজ্ঞাপ্রসূত ছিল। এমন মগুচৈতন্য তরুণ গণিতবিদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

রামানুজান গণিতে যে সব কাজ করেছিলেন সহজ ভাষায় তার পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর এক একটি উপপাদ্য তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন তা চিন্তা করলেও স্তম্ভিত হতে হয়। সংখ্যা সম্বন্ধে রামানুজানের তাৎক্ষণিক চিন্তা কিভাবে কাজ করত তার একটি সুন্দর গল্প হার্ডি বলেছেন, 'সংখ্যার খামখেয়ালীপনা তিনি অভূতভাবে মনে রাখতে পারতেন। লিটলউড বলেছিলেন, প্রত্যেকটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা রামানুজানের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিল। মনে আছে তিনি যখন পাটনিতে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন একদিন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমার ট্যাক্সির নম্বর ছিল ১৭২৯ এবং বলেছিলাম যে সংখ্যাটি বেধ হয় একেবারে সাদামাটা এবং আশা করেছিলাম যে এটা কোন অশুভ সংকেত হবে না। তিনি উত্তর করলেন, না, এটা একটা অত্যন্ত মজার সংখ্যা, এটাই সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যাকে দু'ভাবে দুটো সংখ্যার ত্রিঘাত হিসেবে প্রকাশ করা যায়। ($1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$)। আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম চতুর্থঘাতের অনুরূপ সমস্যার সমাধান তিনি বলতে পারেন কিনা। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন যে, কাছাকাছি কোন উদাহরণের কথা তাঁর জানা নেই তবে তাঁর মনে হয় যে, এ ধরনের প্রথম সংখ্যাটি বেশ বড় হবে।'

বীজগণিতের নানা ফর্মুলা সম্পর্কে, অসীম সিরিজের বিভিন্ন রূপান্তরের ব্যাপারে রামানুজানের অন্তর্দৃষ্টি ছিল বিষ্ময়কর। এ ব্যাপারে তাঁর বোধ হয় কোন তুলনাই ছিল না। অয়লার এবং জেকোবিকে তাঁর সমকক্ষ হয়তো বলা যায়। তিনি সংখ্যাভিত্তিক উদাহরণ থেকে আরোহী পদ্ধতিতে নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করতেন। এই ভাবেই তিনি সংখ্যার বিভাজন সম্পর্কে (যেমন $8 = 3+1 = 2+2 = 1+1+1+1$) তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যে উপনীত হয়েছিলেন যা গণিত ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁর স্মৃতি শক্তি, ধৈর্য এবং গণনা করার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সাধারণীকরণের ক্ষমতা, ফর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনুভব এবং অনুসিদ্ধান্ত দ্রুত পরিমার্জনের ক্ষমতা যা স্বাভাবিকপক্ষে আশ্চর্যজনক ছিল এবং যার জন্যে তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়ে তাঁর কোন তুলনাই ছিল না।

এইভাবে বিজ্ঞানে ইউরোপীয় মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলির সঙ্গে কি করে একজন অর্ধশিক্ষিত ভারতীয় সমানে পাল্লা দিয়ে গণিতের নানা অংশে অক্ষয় চিরভাস্কর অবদান রেখে গিয়েছেন, তা ভাবলেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। নিঃসন্দেহে রামানুজান গণিতের ইতিহাসে একটি একক বিষয় হিসেবেই চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

banglainternet.com

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী

১৯২৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের 'নেচার' পত্রিকায় সি. ভি. রামন এবং কে. এস. কৃষ্ণাণ 'এ নিউ টাইপ অব সেকেন্ডারি রেডিয়েশন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে যে নতুন ধরনের আনুষঙ্গিক বিকিরণের আবিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তাই এখন রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়া নামে বিখ্যাত। বিগত ষাট বছরের পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা অংশে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি লেজারের মাধ্যমে রামন-রশ্মি পাওয়ার পর থেকে তার প্রয়োগের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন গ্যাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা নির্ধারণে, দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়াগতি গবেষণায়, বায়ু ও পানিদূষণ মাপায়, ড্রাগ এনজাইম বিক্রিয়ার ব্যাখ্যায়, অর্ধপরিবাহী বস্তুর প্রযুক্তিতে, দৃষ্টি শক্তির প্রক্রিয়া আলোচনায় এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ত্রিচনোপল্লীর নিকটবর্তী এক গ্রামে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার এবং তাঁর মাতা পার্বতী আম্মলের আটটি সন্তানের দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩০ সালে এবং প্রথম সন্তান সুব্রহ্মণ্যমের পুত্র চন্দ্রশেখর ঐ পুরস্কার পান ১৯৮৩ সালে। রামনের বয়স যখন চার তখন তাঁর পিতা বিশাখাপত্তনের একটি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত এবং ভৌত ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানেই নীল বঙ্গোপসাগরের তীরে রামনের স্কুলজীবন শুরু হয় এবং এখানে থেকেই ১৯০৩ সালে ইন্টারমেডিয়েট পাস করে তিনি চলে যান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজ থেকেই রামন ১৯০৪ সালে বি. এ এবং ১৯০৭ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন।

এম.এ. পড়ার সময়েই রামন পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত পত্রিকা, 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ দুটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার বিষয়বস্তু ছিল আলোর বিবর্তন এবং তরল পাদার্থের পৃষ্ঠটান। সুতরাং বলা যায় যে, রামন বিজ্ঞানী হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না এবং তাঁর পক্ষে স্বাস্থ্যগত কারণে ইংল্যান্ড যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাই রামন ১৯০৭ সালের জুন মাসে সহকারী একউন্ট্যান্ট জেনারেলের চাকরি নিয়ে কলকতা চলে এলেন।

কলকাতায় রামনের প্রথম 'আবিষ্কার' হল ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রিটের 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালকিডেশন অব সায়েন্স' বা বিজ্ঞান সভাগৃহ। প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকারের ভ্রাতৃপুত্র অমৃতলাল সরকার অনেক দিন ধরে একজন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক খুঁজছিলেন। রামনের আগমনে তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হল।

১৯৩২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে রামন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মগুলো সম্পন্ন করেন এই কলকাতা শহরেই। বিজ্ঞান সভা তাঁর জন্য ছিল অব্যাহত দ্বার (তাঁর বাসা থেকে একটা আলাদা দরজাও ছিল) এবং এখান থেকেই তিনি শব্দ ও আলোকবিজ্ঞানের ওপর বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ বিদেশের পত্রিকায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।



বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতা দু'জন দক্ষিণ ভারতীয় মনীষীকে লালন-পালন করেছিল—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। এ দু'জনই বলা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'আবিষ্কার', কেননা তিনি এঁদের দু'জনকে যথাক্রমে 'পঞ্চম জর্জ দর্শনের চেয়ার' এবং পদার্থবিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপকের চেয়ারে' আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন।

১৯২১ সাল আশু মুখার্জির পীড়াপীড়িতেই রামন অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেস-এ যোগদান করার জন্য ইংল্যান্ড যান এবং তখনই তিনি ভূমধ্যসাগরের অবিস্ম্য নীল রঙ দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। বিখ্যাত ইংরেজবিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'গভীর সমুদ্রের অতি প্রশংসিত ঘন নীল রঙের সঙ্গে পানির রঙের কোন সম্পর্ক নেই, এটা আসলে আকাশের নীল রঙের প্রতিফলন মাত্র।' জাহাজে বসেই একটি 'নিকল' ত্রিশিরা নিয়ে একটা সহজ পরীক্ষা করে রামন বুঝতে পেরেছিলেন যে, লর্ড র‍্যালের এ ধারণা ভ্রান্ত।

তখন থেকেই আলোক বিচ্ছিন্নপণের ওপর রামনের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। ১৯২২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বই প্রকাশ করেন, যার নাম ছিল 'আলোর আণবিক বিক্ষেপণ'।

১৯২৩ সালে আমেরিকায় আর্থার কম্পটন পদার্থের আধামুক্ত ইলেক্ট্রন থেকে রঞ্জনরশ্মির বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই তথাকথিত কম্পটন বিক্ষেপণের ফলে রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এই প্রতিভাসের ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেয়া যায়।

সুতরাং প্রশ্ন হল এই যে, রঞ্জনরশ্মি না নিয়ে আমরা যদি সাধারণ দৃশ্যমান আলো নেই তাহলেও কি বিক্ষেপণের ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটবে? এটাই ছিল রামনের সমস্যা।

১৯২৩ সালে রামনের ছাত্র কে.আর. রামনাথন পানি থেকে আলোর বিক্ষেপণের ওপর পরীক্ষা করেন। রামনাথন বিক্ষিপ্ত আলোর সবুজ আলোর সংকেত দেখতে পান যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেঙনি আলোর চেয়ে বেশি, কিন্তু রামন এবং রামনাথন ধারণা করেন যে, এটা আসলে 'দুর্বল প্রতিপ্রভা'। কোন বস্তু আলো শোষণ করে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করলে তাকে বলে প্রতিপ্রভা। প্রতিপ্রভা সুপরিচিত ব্যাপার, নতুন কিছু নয়। কিন্তু এরপর গবেষণায় যোগ দিলেন রামনের শ্রেষ্ঠ ছাত্র কৃষ্ণান এবং কৃষ্ণানের তীক্ষ্ণ চোখেই ধরা পড়ে দৃশ্যমান আলোর আণবিক বিক্ষেপণ। ১৯২৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দিনপঞ্জিতে কৃষ্ণান লিখছেন, 'কোন কোন জৈব তরল পদার্থে অতিবেঙনি আলোর প্রতিপ্রভার সমবর্তন (Polarisation) প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম। ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করলাম যে, সব তরল পদার্থই দৃশ্যমান আলোকেও তীব্র প্রতিপ্রভা দেখায় এবং যা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, এর সবগুলোই তীব্র সমবর্তন গুণসম্পন্ন।' আসলে আণবিক বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া এভাবে লেখা যায়, 'আপতিত আলোক শক্তি + অণুর প্রাথমিক শক্তি → বিক্ষেপিত আলোক শক্তি + অণুর চূড়ান্ত শক্তি' এবং এটাই রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়া। এই



১৯২৮ সালে কলকাতায় আর্নল্ড স্কারফেল্ড (মধ্যে), সি.ভি রামন (ডানে) ও কে. এস কৃষ্ণান (বামে)।

প্রক্রিয়া প্রতিপ্রভা নয়, কেননা প্রতিপ্রভায় সমবর্তন ঘটে না কিন্তু আণবিক বিক্ষেপণে সমবর্তন ঘটে এবং সেটাই কৃষ্ণানের তীক্ষ্ণ চোখে ঐদিন সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল।

রামন প্রক্রিয়া বুঝতে হলে আমাদের বস্তুর গঠন এবং আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। বস্তুর মধ্যে রয়েছে পরমাণু এবং কতগুলি পরমাণু মিলে তৈরি হয় অণু। প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় বা ধনবিদ্যুৎসম্পন্ন। কেন্দ্রীয়ের বাইরে রয়েছে ঋণবিদ্যুৎসম্পন্ন কতগুলি ইলেক্ট্রন। কেন্দ্রীয়ের আধান ইলেক্ট্রনগুলির মোট আধানের সমান, যাতে পরমাণুটি সামগ্রিকভাবে আধানহীন হয়। অণু গঠিত হয় যে পরমাণু দিয়ে সেই পরমাণুগুলির ইলেক্ট্রন এবং কেন্দ্রীয় এমনভাবে বিক্রিয়া করে যাতে সব অণু-পরমাণু একত্রিত হয়ে বস্তুর মধ্যে অবস্থান করতে পারে। বস্তুর এই নকশা বা ছবি আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রায় সবটা এবং পদার্থবিজ্ঞানের অনেকটা ব্যাখ্যা করতে পারে।

পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলির অবস্থা পরমাণুর শক্তি দিয়ে নির্ধারিত হয়। এই শক্তি বিচ্ছিন্ন পরিমাণে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় যা প্রতিটি পরমাণুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এসব অবস্থা আসলে এক একটি স্থিতিাবস্থা যার জীবনকাল খুব অল্পও হতে পারে বা অনেক বেশিও হতে পারে।

অন্যদিকে আলোক হল গতিময় বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি অথবা সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। অর্থাৎ আলোর মধ্যে রয়েছে চলন্ত বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র। যে স্থান দিয়ে এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র যায় তার প্রতিটি বিন্দুতে ক্ষেত্রপ্রাবল্য পর্যায়বৃত্তে পরিবর্তিত হয়। মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে এই ক্ষেত্র একই গতিবেগে চতুর্দিকে সঞ্চরণশীল হয় এবং এর জন্য কোন পৃথক বাহকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আলোক যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি দিয়ে তৈরি তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বস্তুর মধ্যে শোষিত হতে পারে। এভাবে বস্তুর মধ্যে আলোকশক্তি ধরা পড়ে গেলে ইলেক্ট্রনগুলির অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পরমাণু ঐ বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি শোষণ করার পর আবার তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিকিরণ করে দিতে পারে। এমনকি পরমাণু তার নিজের শক্তিও কিছুটা ত্যাগ করতে পারে, যার ফলে যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হয়েছিল তার বেশি নিঃসৃত হতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি শোষিত বা নির্গত অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না বরং তা এক একটি গুচ্ছে বা কোয়ান্টামে (ঝলকে) শোষিত বা নিঃসৃত হয়। প্রতিটি শক্তিগুচ্ছ একটি রাশি দিয়ে চিহ্নিত হয় এবং তা হল ঐ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা সুতরাং প্রতিটি গুচ্ছের বা কোয়ান্টামের শক্তি হল স্পন্দন সংখ্যা এবং একটি ধ্রুবকের গুণফলের সমান—যে ধ্রুবকটিকে প্লাংকের ধ্রুবক বলা হয়, কেননা তিনি এটা আবিষ্কার করেছিলেন।

এখন ধরা যাক, কোন অত্যন্ত পরিশুদ্ধ বস্তুর মধ্য দিয়ে একটি আলোকরশ্মি পাঠানো হল যা একই স্পন্দন সংখ্যার বা একই রঙের। এই আলোক রশ্মির বেশির ভাগই বস্তুকে সরাসরি অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু তার কিছু অংশ পথে যেসব অণু এবং পরমাণু পড়বে সেগুলি দিয়ে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। লর্ড র‍্যালের গত শতাব্দীতে এই বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আলোচনা করেছিলেন এবং তিনি গণনা করে দেখেছিলেন যে, অনেক তরল পদার্থের

ক্ষেত্রে আপতিত আলোক শক্তির প্রায় এক সহস্রাংশ বিক্ষিপ্ত হয় যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান। অবশ্য বিক্ষিপ্ত শক্তির পরিমাণ আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে।

১৮৭৮ সালে জার্মানির লোমেল তাঁর বিক্ষেপণের তত্ত্বে প্রথম দেখান যে, বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে কিছু অংশ থাকবে যার স্পন্দন সংখ্যা আপতিত আলার স্পন্দন সংখ্যা এবং বিক্ষেপণ মাধ্যমের অভ্যন্তরীণ বস্তুকণার স্পন্দন সংখ্যার যোগফলের সমান। ১৯২৩ সালে জার্মানির ক্ষেফল এবং ১৯২৫ সালে ত্র্যামারস ও হাইসেনবার্গ তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে আপতিত বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যার পরিবর্তন বিক্ষেপণ বস্তুর বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করবে। ১৯২৭ সালে ডিরাক তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর তত্ত্বে লব্ধি স্পন্দন সংখ্যার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা হল এই যে, ঐ লব্ধি দুটি স্পন্দন সংখ্যার যোগ অথবা বিয়োগফল হবে, যার একটি বহিঃস্থ এবং অন্যটি অভ্যন্তরীণ। অর্থাৎ একটি আপতিত বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যা এবং অন্যটি বিক্ষেপণকারী অণুর স্পন্দন সংখ্যা। রামন এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন এবং তার মতো আরো অনেকই তা জানতেন। এই ‘স্পন্দন সংখ্যার সমাহার’ পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণের চেষ্টা অনেকেই করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। রামনই এক্ষেত্রে প্রথম সফল পরীক্ষণবিদ পদার্থবিজ্ঞানী।

রামন-প্রক্রিয়ার তত্ত্ব অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। তবু বলা যায়, একটি অণুর ওপর আপতিত আলোক কোয়ান্টাম অণুর সর্বনিম্নাবস্থার উত্তেজিত অবস্থার সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে। এখন সর্বনিম্নাবস্থায় ইলেক্ট্রনের সংখ্যা উত্তেজিত অবস্থার ইলেক্ট্রনের সংখ্যার চাইতে বেশি। সুতরাং সর্বনিম্নাবস্থার ইলেক্ট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং বিক্রিয়ার ফলে ইলেক্ট্রনের শক্তি আলোক-কোয়ান্টামের শক্তির সঙ্গে যোগ হয়ে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্যই স্থায়ী হয় এবং বিক্ষিপ্ত আলোক একই স্পন্দন সংখ্যা এবং একই শক্তিতে নিঃসৃত হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ইলেক্ট্রনের যদি কোন মধ্যবর্তী শক্তিস্তর থাকে তাহলে ইলেক্ট্রন আপতিত রশ্মির পুরোটা নিঃসৃত করবে না, কেননা কিছুটা শক্তি তা শোষণ করে নেবে এবং ফলে ইলেক্ট্রনটি সর্বনিম্নাবস্থার কিছুটা উপরে মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করবে।

অন্যদিকে যদি ইলেক্ট্রনটি আগে থেকেই সর্বনিম্নাবস্থার কিছু উপরে থাকে এবং তার সঙ্গে যদি আপতিত আলোকরশ্মির বিক্রিয়া হয় তাহলে ইলেক্ট্রনটির শক্তিস্তর আরো উপরে উঠে যাবে। তারপর ইলেক্ট্রনটি সর্বনিম্নাবস্থায় ফিরে গেলে এমন আলোক কোয়ান্টাম নির্গত হবে যার স্পন্দন সংখ্যা আপতিত রশ্মির স্পন্দন সংখ্যার চেয়ে বেশি। এইভাবে রামন প্রক্রিয়ায় দু’ধরনের স্পন্দন সংখ্যার বিকিরণ নির্গত হবে যাদের স্টোকস এবং এন্টি-স্টোকস লাইন বলে। এই ধরনের রশ্মির বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা সমবর্তন প্রতিভাস অবশ্যই দেখাবে। রামন এবং কৃষ্ণানি এটাই আবিষ্কার করেছিলেন।

১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রামন সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই আবিষ্কার ঘোষণা করেন এবং ১৬ মার্চ বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের সভায় ‘একটি

নতুন বিকিরণ' নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কলকাতায় ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে দ্রুত বক্তৃতটি ছাপিয়ে তিনি তা সারাবিশ্বে বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এই যে, এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মন্থর গতি অণুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কম্পাঙ্কগুলো নির্ধারণ করা যায় যা অণুর গঠন বোঝার জন্য প্রয়োজন। এ কারণেই এ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার ওপর প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি প্রবন্ধের দুটির লেখক রামন এবং কৃষ্ণান এবং নোবেল বক্তৃতায় রামন স্বীকার করেছেন যে, 'কৃষ্ণানই পরিবর্তিত বিকিরণের সমবর্তন খানি চোখে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেয়ার পর কৃষ্ণান আর কোন দিন রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়ার ওপরে কোন গবেষণা করেননি।

১৯৩২ সালে রামন কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তাঁর কলকাতা ত্যাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং মেঘনাদ সাহাকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু তিনি নিজে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন সে কথা বোধ হয় ঠিক নয়। বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছিল এবং এক পর্যায়ে তিনি অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে ষাট বছর পূর্ণ হলে তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট রামন গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।

বাঙ্গালোরে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের গবেষণার বিষয় ছিল রঞ্জনরশ্মির মাধ্যমে কেলাস বিক্ষেপণ, হীরকের গঠন, ঝারি গতিবিদ্যা ইত্যাদি। এ সময়কার উচ্চ কম্পনের শব্দতরঙ্গ দিয়ে দৃশ্যমান আলোর বিক্ষেপণ সম্পর্কে রামন-নাথ তত্ত্ব সুধীসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। কিন্তু তাঁর অনড় মতবাদ অনেক সময় অগ্রীতিকর বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছে। কোন কোন হীরক কেলাসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 'লাউত্র বিক্ষেপণ' নিয়ে তাঁর সঙ্গে ক্যাথলিন লনসডেলের কলহ, ঝারি গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে ফন কার্মান-ম্যাক্স বর্ণ ভবের বিরুদ্ধে তাঁর অযৌক্তিক দাবি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক রীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এমনকি তাঁর একজন প্রিয় ছাত্রও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, রামন তাঁর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও পছন্দ করতেন না। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর তিক্ত সম্পর্ক ভারতীয় বিজ্ঞানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে বলা যায়। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মস্থল কলকাতা এবং বাঙালিদের স্বয়ংক্রিয় তিনি শেষ বয়সে নানা বিরূপ মন্তব্য করতেন বলে শোনা যায়। অবশ্য বাঙালিদের স্বয়ংক্রিয় এই ধরনের স্পর্শকাতরতা উপমহাদেশে সাম্প্রতিককালের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা যায়।

তবুও একথা সত্য যে, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন বিজ্ঞানী হিসেবে নিঃসন্দেহে একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর গবেষণার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ভারত আজ বিজ্ঞান জগতে অন্যতম স্বীকৃত শক্তি। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বর বাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেন।

মেঘনাদ সাহা, প্রথম জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে মেঘনাদ সাহা'র পুত্র অজিত সাহা এক বিজ্ঞান সম্মেলনে ঢাকায় এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'ছাত্রাবস্থায় যখন কোন এক বইতে পড়েছিলাম যে মেঘনাদ সাহাই হলেন আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের জনক তখন খুব ভাল লেগেছিল।' অজিত সাহা বললেন, 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁর কাজকে এভাবে পথিকৃৎ কাজ বলে স্বীকার করা হয়েছে।' বিখ্যাত পদার্থবিদ সি.এন. ইয়ং (C. N. Yang) লিখেছেন যে, তিনি যখন চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করতে যাচ্ছিলেন তখন তার শিক্ষক তাঁকে কলকাতায় মেঘনাদ সাহা'র সঙ্গে দেখা করে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাই করেছিলেন।

আসলে মেঘনাদ সাহা'র নাম সব সময়ই জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের তাপ আয়নকরণ তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবে। এই তত্ত্ব ব্যবহার করে তিনি তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যা করেছিলেন। যে কোন মৌলিক এবং যুগান্তকারী তত্ত্বের মতোই সাহা'র তত্ত্ব সহজ এবং অবশ্যস্বাভাবী। তাপ-বলবিদ্যার আইন মুক্ত ইলেক্ট্রনের গ্যাসের ক্ষেত্রেও যে প্রয়োগ করা সম্ভব এটাই সাহা'র আবিষ্কার। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও সাহা'র তত্ত্ব আরো যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল আয়নোস্ফিয়ারের তত্ত্ব, অগ্নিশিখার পরিবাহকতা, ইলেকট্রিক আর্ক ইত্যাদি।

সাহা নিজে নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে। তারকার বর্ণালী, তাপ আয়নকরণ, নির্বাচিত বিকিরণ চাপ, বর্ণালী তত্ত্ব, আণবিক বিশ্লেষণ, আনোস্ফিয়ারে বেতার তরঙ্গের পরিচলন, সূর্যের করোনা, সূর্যের বেতার বিকিরণ, চৌম্বক একমেরু, বিটা, তেজস্ক্রিয়তা এবং শিলার বয়স।

শিক্ষক হিসেবে সাহা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রেরণাদানকারী। তিনি কলকাতা এবং এলাহাবাদে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় দুটি সক্রিয় কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কলকাতায় তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, যা এখন সাহা ইনস্টিটিউট নামে খ্যাত। ভারতে একাডেমি অব সায়েন্স সংগঠন গড়ে তোলার মূল কৃতিত্ব তাঁরই যদিও এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সি ভি রামনের যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়েছিল। তিনি বহুকাল যাবৎ 'সায়েন্স এন্ড কালচার' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত সরকার 'কন্সিল অব সায়েন্সিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা করলে সাহা প্রথম থেকেই তার সদস্য ছিলেন। এই কন্সিলের ভারতীয় বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের একজন নির্বাচিত বতন্ত্র সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে তিনি মৌলবাদী হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কিছুটা জড়িত ছিলেন বলে শোনা যায়। জাতীয় পরিকল্পনার কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল

অপরিসীম, বিশেষকরে বিজ্ঞান এবং শিল্পায়নের ব্যাপারে। ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে মেঘনাদ সাহা প্রথম থেকেই তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীর এই পরিকল্পনা কমিশনের দফতরে যাওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাষট্টি বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



মেঘনাদ সাহা'র জন্ম বাংলাদেশে। ঢাকার অদূরে শ্যাওরাতলী গ্রামে ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ সাহা এবং ভুবনেশ্বরী দেবীর আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। একটা ছোট মুদীর দোকানের আয়ে যে সংসার চলত তাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া সহজ ছিল না। গ্রামে কোন হাই স্কুলও ছিল না। সাত মাইল দূরের একটি ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় একজন চিকিৎসক অনন্ত কুমার দাসের বদান্যতায় তিনি ঐ স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর বাসায় থেকেই তিনি লেখাপড়া করেছেন। ১৯০৫ সালে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। এই বছর বাংলা প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় এবং ঐ স্কুলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। বাংলার গভর্নর ঐ স্কুল পরিদর্শনে এলে ছাত্ররা ধর্মঘট করে এবং এরই পরিণামে সাহা তাঁর সরকারি বৃত্তি হারান। সুতরাং বাধ্য হয়ে সাহাকে বেসরকারি কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে ভর্তি হতে হয় এবং এখান থেকেই তিনি পূর্ববঙ্গের সর্ব-পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয়ে ১৯০৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১১ সালে সাহা ঢাকা কলেজ থেকে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি, পাশ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

এরপর সাহা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন সত্যেন বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞান মুখার্জি এবং জানচন্দ্র ঘোষ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তাঁর এক বছরের বড় ছিলেন, নিখিলরতন ধর দু'বছরের। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, গণিতে ডি.এন. মল্লিক এবং সি.ই. কালিস। ১৯১৩ সালে গণিতে সম্মানসহ বি.এসসি, পরীক্ষায় এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে এম.এসসি, পরীক্ষায় সাহা হয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়, প্রথম হয়েছিলেন সত্যেন বসু।

এক সময়ে সাহা ইন্ডিয়ান ফিনান্স সার্ভিসে যোগ দেয়ার জন্য পরীক্ষা দেয়ার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সরকারের অনুমতি মেলেনি। সাহা ফলিত গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করতে মনস্থির করে ফেললেন। তাঁর এবং তাঁর ছোট ভাইয়ের জীবনধারণের জন্য এ সময় তাঁকে প্রাইভেট টিউশানি করতে হয়েছে—সাইকেলে করে তাঁকে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৈনিক যাতায়াত করতে হয়েছে। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জাস্টিস আন্তোয় মুখার্জির প্রচেষ্টায় একটি ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা এবং গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি। তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ নামক দু'জন আইনবিদের বদান্যতায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বসু গণিত বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯১৭ সালে তাঁরা দু'জনেই সৌভাগ্যক্রমে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। কিছুদিন পরে সি.ভি. রামন এই বিভাগে পালিত অধ্যাপক হয়ে আসেন।

১৯১৯ সালে এই বিভাগে যোগ দেন ডি.এম. বসু যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার্লিনে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন,

‘পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে আমার দু'জন সহকর্মী ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং এস.এন. বসু। জার্মানিতে, বিশেষকরে বার্লিনে এ সময় পদার্থবিজ্ঞানে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানতেন না। এ সময়ে বার্লিনে সমবেত হয়েছিলেন প্র্যাংক, আইনস্টাইন, ভারবুর্গ, ম্যাক্স বর্ন, ওয়াল্টার নারনষ্ট-এর মতো বিজ্ঞানীরা—যাঁরা কোয়ান্টাম এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং যারা তখন এসব তত্ত্বের তাত্ত্বিক অগ্রগতি এবং পরীক্ষণভিত্তিক যাচাইকরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আমি আমার এই দু'জন সহকর্মীর বৈশিষ্ট্য মনে করতে পারি, যা তাঁদের বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। এস.এন. বসুকে আমি প্র্যাংকের দুটি বই ‘থার্মোডিনামিক’ এবং ‘ভার্মেস্ট্রাহলুং’ পড়তে দেই যা এ সময়ে এদেশে পাওয়া যেত না। এস.এন. বসু অল্পসংখ্যক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্র্যাংক যৌক্তিক পদ্ধতিতে যেভাবে সমগ্র তাপবলবিদ্যা নির্ধারণ করেছিলেন তার প্রশংসা করতেন। কিন্তু অন্যদিকে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সংক্রান্ত বর্ণালী শক্তি বণ্টনের আইন চিরায়ত বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ত্ব এবং তাপবলবিদ্যার

ভিত্তিতেই করা হয়েছিল যার সঙ্গে শুধু কোয়ান্টাম অনুসিদ্ধান্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিল। এস.এন. বসু প্রাথকের এই উপস্থাপনার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ধরতে পেরেছিলেন এবং প্রাথকের 'থার্মোডিনামিকে'র যে বৈশিষ্ট্য সেই পরিষ্কার যৌক্তিক নির্ধারণের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। প্রাথকের বিকিরণ সমীকরণের নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর এই বৌদ্ধিক অবদানকে থেকেই আমার মনে হয় বসু ১৯১৫ সালে প্রাথকের সমীকরণের একটি সমাহার-গণিতভিত্তিক নির্ধারণ দিতে পেরেছিলেন।

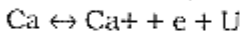
'মেঘনাদ সাহার গবেষণার ধরন ছিল সরাসরি। তিনি আমার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার দিগন্তে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে চাইতেন বিশেষ করে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান এবং তাপবলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার। কোন কোন সময়ে তিনি আমার সঙ্গে গ্যাসের তাপ আয়নকরণ তত্ত্ব এবং তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করতেন।'

১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘনাদ সাহাকে তাঁর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব এবং বিকিরণ-চাপের ওপর কাজের ভিত্তিতে ডি.এসসি. ডিগ্রি প্রদান করেন। অন্যদিকে সত্যেন বসু জীবনে এম.এ. ছাড়া অন্য কোন ডিগ্রি পাননি। এ সময় পর্যন্ত সাহার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা দশটি যার সবগুলিকেই খুব উল্লেখযোগ্য কাজ বলা যায় না। কিন্তু স্পষ্টতই সাহা দৈনন্দিক প্রকাশনার মূল্য বুঝতেন। তাঁকে এ সময় প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিও দেয়া হয় এবং ১৯২০ সালে সাহা এক বছরের জন্য ইংল্যান্ড ও জার্মানি যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছিলেন।

মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান আগেই বলা হয়েছে— উচ্চ তাপমাত্রায় আয়নকরণ তত্ত্ব এবং তারকার আবহাওয়া পমিঙলে তার প্রয়োগ। আজকাল যা সাহা সমীকরণ নামে পরিচিত, তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসের ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, 'অন অ্যায়োনাইজেশন ইন দি সোলার ক্রোমোস্ফেরার' বা সূর্যের বর্ণগোলার্ধে আয়নকরণ। ভৌত রসায়নের ভাষা ব্যবহার করে সাহা তাঁর সমীকরণকে বলেছিলেন 'আয়নকরণের জন্য বিক্রিয়া-সমচাপের নমকিরণ।'

ধরা যাক, আমরা ক্যালসিয়াম পরমাণুর কথা চিন্তা করছি। এই পরমাণু ভেঙে ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ইলেক্ট্রন তৈরি হয়।

ক্যালসিয়াম পরমাণু \leftrightarrow ক্যালসিয়াম আয়ন + ইলেক্ট্রন + নিঃসৃত শক্তি



ধরা যাক, এক গ্রাম এটম ক্যালসিয়াম পরমাণুর x ভগ্নাংশ আয়নায়িত হয় যার চাপ p এবং তাপমাত্রা T ; তাহলে দেখানো যায় যে, এটাই সাহার বিখ্যাত সমীকরণ।

সাহার এই তাপ আয়নকরণের তত্ত্ব জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করে, কেননা এই প্রথম তাপবলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল। এই ব্যাখ্যায় শুধু প্রয়োজন তারকার আবহাওয়ায়ামণ্ডলের ভৌত অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্যের। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি সাহার সমীকরণ দিয়ে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

সাহা তাঁর ভক্তে কিভাবে উপনীত হয়েছিলেন তা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন,

‘জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সময়ে এবং এম.এসসি, শ্রেণীতে তাপবলবিদ্যা ও বর্ণালীতত্ত্ব পড়ার সময় ১৯১৯ সালের দিকে তাপ আয়নকরণের তত্ত্ব আমার মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। আমি জার্মান জার্নাল নিয়মিত পড়তাম এবং সেভাবেই জে. এগার্টের একটি প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হই— যেখানে তিনি নারনষ্ট-এর তাপ-উপপাদ্য প্রয়োগ করে তারকায় উচ্চ তাপমাত্রায় বিপুল আয়নকরণ ব্যাখ্যা করেছিলেন---।

নারনষ্ট-এর ছাত্র এবং ঐ সময়ের সহকারী এগার্ট তাপ আয়নকরণের একটি সমীকরণ দিয়েছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি পরমাণুর আয়নকরণ বিভবের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এই বিভবের ওরত্ব ঐ সময়ে বোরের তাত্ত্বিক কাজ এবং প্র্যাংক ও হার্বসের পরক্ষিপলক কাজের ফলে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

এগার্টের প্রবন্ধটি পড়ার সময় আমি তাঁর সমীকরণে আয়নকরণ বিভবের মান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, যা দিয়ে যে কোন পাদার্থের যে কোন তাপ এবং চাপের এক অথবা বহু আয়নকরণ নিখুঁতভাবে গণনা করা যায়।

এভাবেই আমার নামে যে সমীকরণটি এখন পরিচিত তা আমি পেয়েছিলাম। সূর্যের ক্রোমোস্ফেরারের সমস্যা সম্বন্ধে আমি আগেই পরিচিত ছিলাম। সুতরাং আমার সমীকরণ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) আমি চারটি প্রবন্ধ রচনা করে ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।’

এ সময়েই সাহা লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে প্রফেসর এ. ফাউলারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অধ্যাপক ফাউলারের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ফাউলারের অগাধ জ্ঞান এবং তাঁর সজ্জিত নানা তথ্য ব্যবহার করে সাহা তাঁর প্রবন্ধের উন্নতি করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ সময় সাহা ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন, নেচার, প্রসিডিংস অব রয়াল সোসাইটি জার্নালে যে চার-পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলা যায়। তাঁর এর পরের চৌদ্দক একমেক সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটিকে একই রকমভাবে উল্লেখযোগ্য বলা যায়।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে সাহা ইউরোপ থেকে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং দু’বছর পরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি পনের বছর ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিল ডি.এস. কোঠারি, আর.সি. মজুমদার, পি.কে. কিচলু, জি.আর. টোসনিওয়াল, বি.এন. শ্রীবাস্তব, এ. এন. চ্যান্ডন এবং আরো অনেকে।

১৯২৬ সালে মেঘনাদ সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিত শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে সাহা এবং ডি.এম. রসু ইতালির কোমো শহরে ভোল্টা শতবার্ষিকী উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখ করা যায়

যে, এই সম্মেলনেই নীলস বোর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দার্শনিক পটভূমি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা এই বিষয়ের ওপর একটি মাইল ফলক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সাহা বা ডি.এম. বসুর কোন লেখায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাহাকে পালিত অধ্যাপক পদে নিয়োগদান করেন। এই পদে সি.ভি. রামন এবং ডি.এম. বসু এক সময় কাজ করেছেন এবং সাহাও এ পদে কাজ করেছেন প্রায় পনের বছর। এ সময় তিনি প্রশাসনিক কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতেন এবং ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (পরে সাহা ইনস্টিটিউট) সংগঠনের কাজেও তাকে ব্যাপৃত থাকতে হত। আরো একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর শক্তি এবং সময় দিতে হত, সেটি হল মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কন্সটিভেশন অব সায়েন্স'। ১৯২৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণাগার থেকেই রামন এবং কৃষ্ণান রামন-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ডিরেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়, যার প্রথম অধিকারী ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তিনি ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অবৈতনিক ডিরেক্টর ছিলেন।

১৯৩৪ সালের মোসাই বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি ছিলেন মেঘনাদ সাহা। তাঁর ভাষণের প্রথম অংশে ছিল জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে তিনি একটি 'সর্বভারতীয় একাডেমি অব সায়েন্সেস' গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এ ২ ভাষণেই তিনি বন্যা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং একটি নদী গবেষণাগার স্থাপনের কথা বলেছিলেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর পানি ব্যবহারের তাঁর প্রস্তাব থেকেই পরবর্তীকালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের সৃষ্টি হয়।

মেঘনাদ সাহার জীবন এবং গবেষণা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কেননা যে কোন বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের ব্যাপারে তাঁর উপদেশ এবং সহযোগিতা ছিল প্রকল্পের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত। বিজ্ঞানের প্রতি মেঘনাদ সাহার অঙ্গীকার ছিল প্রবাদ বাক্যস্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা সব সময়ই অণুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর নিজের কথায় বলা যায়,

'আমাদের সতীর্থদের প্রতি দয়া এবং সেবার আদর্শ সব মহান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারাই বলে গিয়েছেন এবং সন্দেহ নেই কোন কোন মহান রাজা এবং মন্ত্রী এই দর্শন গীতাবায়নের চেঁচাও সব সময় এবং সব দেশেই করেছেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সফল যেনি ওধু এই সহজ কারণে যে, উৎপাদনের ব্যবস্থা সকলের জন্য প্রাচুর্য সৃষ্টি করার পক্ষে খেটে ছিল না যা কার্যকরী জনহিতের একমাত্র শর্ত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের জীবনের জন্য বিজ্ঞান সেই লক্ষ্য অর্জন করেছে যা পৃথিবীর সব ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিক কারণে সম্পদের অসম বিন্যাস আজ সামাজিক আইন প্রবর্তনের ফলে দ্রুত দূর করা সম্ভব হচ্ছে।'

banglainternet.com

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব

১৯২১ সালের মে মাসের কোন এক সময়ে ঢাকায় প্রথম এলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আর তারপর থেকে পুরনো ঢাকা আর রইলো না শুধু ইতিহাসের পাতায়, উঠে এল বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আত্মনায়। ঐ বৎসরই কলকাতার এক প্রভাবশালী মহলের প্রবল বিরোধিতার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ঈশ্বর মিল লেনের এক প্রতিভাবান তরুণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের পদে ইস্তফা দিয়ে হিজল-তমালের দেশে, শাপলা-শালুক আর কৃষ্ণচূড়ার মাঝে মুগ্ধবিশ্বয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

এর আগে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ভাইস চ্যান্সেলর পি.জে. হার্টগকে দেখা এক চিঠিতে সত্যেন বসু 'পরীক্ষণ অথবা গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে রিডার হিসেবে ঢাকায় আসার সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পত্রে ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধের' তালিকা তিনি দিয়েছিলেন এইভাবে,

'(১) অন দি ট্রেন্ড ইন কুয়েশন অব ইকুইলিব্রিয়াম—বুলেটিন, ক্যালকাটা মাথ্যামেটিকাল সোসাইটি।

(২) অন দি হেরপরাহেড—ঐ।

(৩) অন দি ইকুয়েশন অব স্টেট—ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন।

(৪) ডিডাকশান অব রিডবার্গ ল' ফ্রম দি কোয়ান্টাম থিওরি—ঐ।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর গভর্নর রোনাল্ডশে ৮ ফেব্রুয়ারি মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে রিডার হিসেবে সত্যেন বসুর নিয়োগ অনুমোদন করেন। একই আদেশপত্রে ঢাকা কলেজের ডব্লিউ.এ. জেনকিনসকে অনুমোদিত বেতনে পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে আইনের প্রফেসর নিয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বে জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে জেনকিনস রিডার পদের জন্য সত্যেন বসুকে সুপারিশ করে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। জেনকিনস হার্টগকে লিখেছেন, 'আমি আবেদনপত্রগুলি দেখেছি এবং যাদের পদার্থবিজ্ঞানের রিডার হিসেবে নির্বাচন করা যায় তাঁদের গবেষণাকর্ম যত্নের সঙ্গে পড়েছি। আমার মতে সবচেয়ে ভাল নিয়োগ হবে এস.এন. বোস অথবা মেঘনাদ সাহা। উভয় প্রার্থীই শক্তিশালী এবং মৌলিক গবেষক। যদিও সাহা বসুর চাইতে বেশি এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ করেছেন, তবু ফিল. ম্যাগ.-এ বসুর শেষ প্রবন্ধটি তাঁকে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল বলে প্রমাণ করে। সাহা যেসব সুযোগ পেয়েছেন বসু এ পর্যন্ত তা পাননি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দাবিকেই সমর্থন করতে আগ্রহী। বসুর সম্বন্ধে আমি যা জানি এবং শুনেছি তা থেকে বলতে পারি যে, তিনি উৎসাহের সঙ্গে এবং অন্যদের সঙ্গে স্বাক্ষর্যে কাজ করতেন। আমার মনে হয় তাঁকে আনার চেষ্টা করা উচিত।'

সভ্যতান বসু এ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলিত গণিত এবং পদার্থবিদ্যার প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সার আওতোষ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে তাঁর ঢাকায় আসার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন এবং ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে তিনি হার্টগকে জানান যে, 'জুন অথবা তার আগেই' তিনি ঢাকা পৌঁছে যাবেন।



সূত্রাং বলা যায় যে, ১৯২১ সালের ১ জুন আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম। সত্যেন বসু পড়াতেন তাপ-বলবিদ্যা এবং মাস্ক্রোয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব। আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়েও তিনি পড়াশোনা করতেন এবং ঐ সময়কার পদার্থবিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই কল্পনা করুন দুই বৎসর পরে তাঁর 'শুশিহীন বিষয়' না 'আনপ্রেজেন্ট সারপ্রাইজ', যখন বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ তাকে জানালেন যে, 'মাসিক ৫০০ টাকা স্থির বেতনে দুই বৎসরের' জন্য তাকে পুনর্নিয়োগ করা হল। সত্যেন বসু সঙ্গত কারণেই অভিমানভরে পি.জে. হার্টগকে লিখলেন,

'যদি দুই বৎসর নিরলস এবং বিবেকসম্পন্ন প্রয়াসের স্বীকৃতি এইভাবে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় দেয়, তবে আমার মনে হয় কারো পক্ষে বোকা কষ্টকর হবে না বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে।'

এ ধরনের স্বীকৃতি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই প্রথম নয় এবং শেষও নয়। তবু ভাইস চ্যান্সেলর তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এই বলে,

‘বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে সকল শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল অথবা যাদের নিয়োগ এই বৎসরে শেষ হবে তাঁদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের নিয়োগ ১৯২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এবং আপনিও সেইভাবে চিঠি পেয়েছেন।’

কিন্তু সত্যেন বসুকে এভাবে চিঠি দেয়া যায় না। হার্টগ যাই লিখুন, সত্যেন বসুর প্রতিভা তাঁর অজানা ছিল না। তাই ১৯২৩ সালের ৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি কমিটি গঠন করেন, মি. এস. এন. বসুর সাফাৎ নেয়ার জন্য যাতে তিনি কি কি শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে রাজি হবেন তা নির্ধারণ করা যায়। কমিটিতে ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর পি.জে. হার্টগ, প্রফেসর জে.সি. ঘোষ এবং পি.কে. ঘোষ বার-এট-ল’। পরে প্রফেসর জেনকিনসকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে এই কমিটি ‘বসু কমিটি’ নামে পরিচিত।

‘বসু কমিটি’র ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, খুব সম্ভব এই সময়েই বসু পরিসংখ্যান সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নিজের ওপর অগাধ আস্থা ছিল বলেই সত্যেন বসু ১৯২৩ সালের ২৭ আগস্ট ‘বসু কমিটি’র কাছে আবেদন করেন যে তাঁকে ‘১৯২৪ সালের সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে দুই বৎসরের শিক্ষা-ছুটি’ আর ১২,৫০০ টাকা ঋণ দেয়া হোক। হার্টগ এবং জেনকিনস দু’জনেই তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছেন। তাই ১৯২৩ সালের ১ ডিসেম্বর তাঁকে রিভার হিসেবে পুনর্নিয়োগ করা হয় মাসিক ৬৫০ টাকা বেতনে যা ১৯২৪ সালের ১ জুলাই সর্বোচ্চ ৭০০ টাকায় পৌছবে।

এদিকে ‘বসু কমিটি’ বেশ কয়েকবার মিলিত হন— জেনকিনস-এর টেনিস ক্রীড়াসূচি এবং পি.কে. ঘোষের কোর্ট-উপস্থিতির কর্মসূচি ইত্যাদি অসুবিধা সত্ত্বেও। ১৯২৪ সালের ২ মার্চ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সত্যেন বসুকে দুই বৎসরের শিক্ষা-ছুটি দেয়া যেতে পারে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এজন্য তাঁকে ১৩,৮০০ টাকা ঋণ দেয়া হবে,

‘...যদি সরকার বর্তমান বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অনুদান দেন।’

অতিরিক্ত অনুদান পাওয়া গিয়েছিল কিনা জানা যায়নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯২৪ সালের ৯ আগস্টের সভায় সত্যেন বসুর জন্য ‘১৯২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর বা তার কাছাকাছি সময় থেকে শুরু করে ১৯২৬ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত দুই বৎসরের শিক্ষা ছুটি’ মঞ্জুর করেন।

আসলে ‘বসু কমিটি’ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের বিচার-বিবেচনা স্বচ্ছ এবং ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে ছোত্রি একটি চিঠি। হাতে লেখা চিঠি সাধারণ কাগজে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদের এটি একটি।

প্রিয় সহকর্মী,

আমি আপনার প্রবন্ধটি ভাষান্তর করেছি এবং সাইট্রিফট ফ্যুর ফিজিকে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান বলে মনে হয় এবং

আমাকে তা খুশি করেছে। আমার কাজ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য আমি সম্পূর্ণ সঠিক মনে করি না। কোননা ভিলের সরণ সূত্রের জন্য তরঙ্গতত্ত্বের অনুমান প্রয়োজন হয় না এবং বোরের নীতিও মোটেই ব্যবহার করতে হয় না। তবে নিশ্চয়ই সেজন্য কিছু আসে যায় না। আপনিই প্রথম উৎপাদকটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে নির্ধারণ করেছেন যদিও সমবর্তন উৎপাদক ২ সম্বন্ধে যুক্তি অতটা জোরালো নয়। এটি বাস্তবিকই একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

বন্ধুসুলভ অভিবাদনান্তে,
আপনার
এ. আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের এই চিঠির ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে শিক্ষা-ঋণ এবং শিক্ষা-ছুটি দিয়েছিল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভাইস চ্যান্সেলর ইংল্যান্ডে রাদারফোর্ড আর ব্র্যাণকেও চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের গবেষণাগারে সত্যেন বসুকে কাজ করার সুবিধা দিতে কিন্তু সেখানে তখন স্থান ছিল না এবং তাই সে যাত্রায় সত্যেন বসুর ইংল্যান্ড যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ইউরোপের পথে সত্যেন বসু বোম্বাই পৌছান ১৯২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর (ছিলেন ব্যালার্ডপিয়ের হোটলে) এবং প্যারিস পৌছান অক্টোবরের ১৮ তারিখে (প্যারিসের ঠিকানা ছিল ১৭ নং দ্য সেন্ট-রার্ড)।

সত্যেন বসু ইউরোপে কি করেছিলেন তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বলা যায়। ১৯২৫ সালের ২২ জানুয়ারি তারিখে তিনি প্যারিস থেকে ভাইস চ্যান্সেলরকে লেখেন,

‘এই বছরের প্রথম থেকে কুরি গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ আমাকে দেয়া হয়েছে। কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রয়েসর লাজেভার বক্তৃতা শুনতে আমি উপস্থিত থাকি। তিনি আমার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সদয় ব্যবহার করেছেন এবং আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি গাণিতিক সমস্যার ওপর আমাকে কাজ কতে বলেছেন।’

তারিখবিহীন আর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন,

‘বর্তমানে আমি এম. দ্য ব্রগলির রঞ্জনরশ্মি গবেষণাগারে কাজ করছি। আগামী বছরের শুরু থেকে রেডিয়াম ইসটিটিউটে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে বলে মাদাম কুরি আমাকে আশা দিয়েছেন।’

আসলে কলেজ দ্য ফ্রাঁসের প্রফেসর সিলভা লেভি প্রয়েসর লাজেভার সঙ্গে সত্যেন বসুর পরিচয় করে দেন ‘যা থেকে বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজ করার এই সব সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।’

সত্যেন বসুর কাছে ‘ইউরোপীয় শীতের প্রথম অভিজ্ঞতা মোটেই অস্বাচ্ছন্দ্যজনক ছিল না। তিনি তাঁর ইউরোপ প্রবাসকে ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যদিও প্রথমদিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ড যাওয়া। পরিকল্পনা পরিবর্তনের কারণ জানা যায় না। তবে রাদারফোর্ড তাঁর গবেষণাগারে স্থানাভাবের কথা বলেছিলেন। ১৯২৪ সালের ২০ নভেম্বরের একটি চিঠিতে হার্টগ রাদারফোর্ডকে লিখছেন, ‘আপনার জায়গার ওপর চাপের ব্যাপার আমি ভালভাবেই বুঝি।’

এদিকে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে পদার্থবিজ্ঞানের একটি অধ্যাপক পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে। প্রার্থীদের ভারতীয় অথবা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ওপর উচ্চ ডিগ্রি থাকতে হবে এবং যাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে ও যারা গবেষণাকর্মে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

ইউরোপ থেকে সত্যেন বসু ঐ পদের জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁর আবেদনপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি আমার জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশনের পর আমি কলকাতার প্রেসভিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করি এবং ১৯১৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ফলিত গণিত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করি। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে প্রভাষক হিসেবে কাজ করি এবং ১৯২১ সাল থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রিডার হিসেবে কর্মরত।

তাঁর সম্বন্ধে পরিচিতিমূলক সুপারিশ দেয়ার জন্য তিনি যাদের নাম করেন তাঁরা হলেন প্রফেসর এ. আইনস্টাইন, প্রফেসর পল লাজেউঁ এবং ড. হেরমান মার্ক। তিনি তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের নিম্নলিখিত তালিকা পাঠিয়েছিলেন,

(১) অন দি ইনফ্লুয়েন্স অব ফাইনাইট ভলিউম অন দি ইকুয়েশন অব স্টেট, (বসু ও সাহা), ফিল. ম্যাগ. ১৯১৮ আগস্ট।

(২) রিডবার্গ ল ফ্রম কোয়ান্টাম থিওরি, ফিল. ম্যাগ. ১৯২০, ৬১৯।

(৩) ইনটিগ্রেশন অব স্ট্রেস ইকুয়েশন ক্যাল. ম্যাথ. সোসা. বুল.।

(৪) অন দি হেরপোলহোভ, ক্যাল. ম্যাথ. সোসা. বুল।

(৫) প্র্যাংকস গেসেস উন্ড লিখট কোয়ান্টেন হিপোথিসেস, জেড ফ্যার ফিজ ১৯২৪।

(৬) ভের্মেগ্লাইখগেভিষ্ট ইন ট্রাহলেন ফেল্ড, জেড ফ্যার ফিজ. ১৯২৪।

এই নতুন তালিকা থেকে একথা স্পষ্ট যে বসুর বিখ্যাত প্রবন্ধটি (৫নং) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়েই রচিত হয়েছিল—কলতাকায় নয়। ভারি কণা সম্পর্কে ৬নং প্রবন্ধটিও আইনস্টাইন ভাষান্তর করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১৯২৬ সালের ১৬ মার্চ আইনস্টাইন তাঁর সুপারিশ পাঠান,

‘এ পর্যন্ত এস. এন. বোসের গবেষণাসমূহ, বিশেষকরে তাঁর আলোক এবং ভরসম্পন্ন বস্তুকণার তত্ত্ব, আমার মতে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী অবদান। বসুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের পর আমার এই ধারণা হয়েছে যে, তিনি সেই রকম একজন মানুষ, যার কাছ থেকে বিজ্ঞান আরও অনেক কিছু আশা করে...।

প্যারিস থেকে লাজেউঁ লেখেন (২০.৪.১৯২৬),

‘...সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমার অধীনে এক বৎসর ১৯২৪-২৫ প্যারিসে কাজ করেছেন। বসুর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করি।’

বার্লিন থেকে হেরমান মার্ক দীর্ঘ চিঠিতে লেখেন (২.৫.১৯২৬),

‘.... সম্প্রতি কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউটে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদার্থবিজ্ঞানের একটি গবেষণায় ব্যাপ্ত ছিলেন যা রঞ্জনরশ্মি সংক্রান্ত...।’

কলেজ দ্র ফ্রাঁস থেকে সিলভা লেভি লেখেন (১০.৫.১৯২৬),

“আমি পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ওপর মত প্রকাশের যোগ্যতা রাখি না, কিন্তু এখানে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে তাঁর প্রতিভা সন্দেহে উচ্চ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। আমি নিজে বলতে পারি এস. এন. বোস আমার পরিচিতের মধ্যে একজন অত্যন্ত উচ্চদের বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব—তাঁর মন আশ্চর্যজনকভাবে উন্মুক্ত, উজ্জ্বল, সক্রিয় এবং বহুমুখী। আমার চেনা-জানা অত্যন্ত স্নেহপরায়েন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনি তাঁর ছাত্রদের ওপর গভীর এবং ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।’

সিলভা লেভির প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ বরে প্রমাণিত হয়েছে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপিত অধ্যাপক পদটির জন্য আরো একজন প্রার্থী ছিলেন। তিনি হলেন কলকাতার ডি. ডি. এম. বসু। বার্লিনে তিনি বহুকাল কাটিয়েছেন এবং জৌরহুজের ওপর গবেষণায় যথেষ্ট ব্যাতিলাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক-নির্বাহী কমিটির বিশেষজ্ঞ ছিলেন কোয়ান্টাম-বলবিদ্যার বিখ্যাত শিক্ষক মিউনিখের আর্নল্ড সমারফেল্ড। ১৯২৬ সালের ৩১ আগস্ট সমারফেল্ড নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠান,

‘উভয় প্রার্থী অত্যন্ত যোগ্য; এস.এন. বোস বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী; ডি. এম. বোস প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষণবিদ এবং তত্ত্ববিজ্ঞানী; সম্ভবত শেষোক্তজনকে পছন্দ করা যায়।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের মতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন যা দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল আর করা হয় না— এমনকি ‘বোস চেয়ারে’ নিয়োগের ক্ষেত্রেও না। ১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রফেসরের পদটি ডি.এম. বসুকেই প্রদান করেন এবং এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন যে, ‘ডি.ডি.এম. বসু যোগদান না করলে মি. এস. এন. বসুকে’ পদটি দেয়া হবে।’

এইরূপ থেকে ফিরে এসে সত্যেন বসু রিডার হিসেবে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯২৬ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর এবং ডি.এম. বসু ঢাকায় আসার অপারগতা জানালে সত্যেন বসুকে প্রফেসর এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান নিয়োগ করা হয় ১৯২৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি।

পরের বৎসর ১৯২৮ সালে আর্নল্ড সমারফেল্ড ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সত্যেন বসুর উদ্যোগে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানায় ঢাকায় আসার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালোরে জুরে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ১৪ দিন নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আর ঢাকায় আসতে পারেননি। সমারফেল্ডের বিশেষ অনুরোধে সত্যেন বসু কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে সত্যেন বসু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগটিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। সে সময়ে রঞ্জনরশ্মির কেলাস তত্ত্ব, রামান-

প্রক্রিয়া, চুম্বকত্ব, বর্ণালী প্রতিপ্রভা, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মৌলিক গবেষণা তিনিই এই বিভাগে শুরু করেছিলেন। প্রায় দুই দশক তাঁর উদ্যোগে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং এই বিভাগের এটাই ছিল স্বর্ণযুগ। তারপর নেমে আসে পাকিস্তানি আমলের অন্ধকার।

১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বসুকে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে পুনর্নিয়োগ দান করেন 'সেই শিক্ষালব্ধ পর্যন্ত যখন তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে উপনীত হবেন।' ১৯৪৫ সালে সত্যেন বসুর বয়স ৫১ বৎসরের হলে অবসর গ্রহণের পরও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখার জন্য কিছু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চিরাচরিত ক্রেদাজে রাজনৈতিক আবাহাওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। এ সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খয়রা প্রফেসরের পদটি গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। ১৯৪৫ সালের ২ জুলাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দেন যে, 'তিনি ইতিমধ্যেই কলকাতার প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' এ বৎসরই কোন এক সময়ে তিনি চিরদিনের জন্য ঢাকা পরিত্যাগ করে চলে যান। বলকাতা থেকে তারিখহীন একটি এক জাহানের পত্রে সত্যেন বসু ১৯৪৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং ঢাকা হলের প্রভোস্ট পদে ইস্তফা দেন। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসুর ২৪ বৎসরের কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু কি আশ্চর্য পৌরবসয় এই চব্বিশটি বছর।

১৯৭৪ সালে আমি সত্যেন বসুকে কলকাতার রাজভবনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ম্যাক্স প্লাংকের বিকিরণ সূত্র নির্ধারণে যে যৌক্তিক অসঙ্গতি ছিল সে সম্বন্ধে এত পরিষ্কার ধারণা আপনি কি করে করেছিলেন?' তিনি তাঁর অনবদ্য স্মিত হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আমি তাদের ওখানে বিকিরণ তত্ত্ব পড়াতাম যে, রে।'

এই সময়কার যুগসন্ধিক্ষণ বুঝতে হলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পদার্থবিজ্ঞানে একটা চরম অস্থিত্বজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে অনেক পরীক্ষণলব্ধ তথ্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। যেমন কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা একটি আবদ্ধ বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিকিরণ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই বিকিরণের মধ্যে সব স্পন্দন সংখ্যাই থাকবে এবং প্রতিটি স্পন্দন সংখ্যার সঙ্গে জড়িত শক্তির পরিমাণও পরীক্ষা করে মাপা সম্ভব। স্পন্দন সংখ্যা অনুসারে বিকিরণ শক্তির বন্টন একটা বিশেষ ধরনের হয়— প্রথমে তা শূন্য থেকে উঠতে শুরু করে, তারপর তার একটা সর্বোচ্চ চূড়া থাকে এবং তারপর আবার তা ধীরে ধীরে শূন্যে নেমে আসে। এই সুন্দর প্রকৃতি কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা সেখানে দাবি করা হয় যে, বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যা যত বাড়বে তার শক্তিও তত বৃদ্ধি পাবে। অবশ্যই এটা একটা অবজব ব্যাপার কেননা তাহলে সমগ্র বিশ্ব এক সময় অতি উচ্চ শক্তির বিকিরণ দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যেত, যার ফলে প্রাণের অস্তিত্বই থাকতে পারত না।

ম্যাক্স প্লাংক এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলেন একটা অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে। তিনি একটা পরীক্ষণভিত্তিক সমীকরণ আন্দাজ করেছিলেন যা দিয়ে

বিকিরণের শক্তিবর্টন সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু শুধু সমীকরণটি আন্দাজ করেই তিনি চূপ করে বসে ছিলেন না। ঐ সমীকরণের ভিত্তি খোঁজার কাজেও তিনি ব্যাপৃত হলেন এবং দেখলেন যে, সমীকরণটি নির্ধারণ করা যায় যদি বিকিরণকে কণা দিয়ে তৈরি বলে কল্পনা করা হয়।

এ পর্যন্ত ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে যে, বিকিরণ হল একটা অবিশ্লিষ্ট তরঙ্গ কিন্তু এখন প্রাংকের সমীকরণ দাবি করছে যে, বিকিরণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (বিচ্ছিন্ন) কণা হিসেবেও চিন্তা করা দরকার। আলো শুধু যে তরঙ্গ বলে আমরা এত দিন জেনে এসেছি সেটাই সব নয়। আলো ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি এটাও এখন স্বীকার করে নিতে হবে। এসব কণাকে বলে ফোটন বা আলোক কণা এবং প্রতিটি ফোটন হল একটি কোয়ান্টাম বা শক্তিশূন্য যা স্পন্দন সংখ্যার গুণিতক। এভাবেই অনুগ্রহণ করল বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

প্রাংক বাধ্য হয়ে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ধারণার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এলেন, কিন্তু তিনি নিজেও প্রথমদিকে বুঝতে পারেননি যে, তাঁর বিপ্লব কতটা ব্যাপক। এটা বুঝতে পেরেছিলেন সর্বপ্রথম আইনস্টাইন এবং তিনিই প্রথম কোয়ান্টাম ধারণা সর্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু প্রাংকের সমীকরণ নির্ধারণে যে একটা ত্রুটি ছিল, এটা অনেকেরই চোখে পড়েনি।

সত্যেন বসুর চোখে এই ত্রুটি ধরা পড়ে। ত্রুটিটি হল এই যে, প্রাংকের সমীকরণে দুটি অংশ আছে। এক অংশে রয়েছে বিকিরণের শক্তি। এই অংশ নির্ধারণের জন্য প্রাংক অনুমান করেছিলেন যে, বিকিরণ হল বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তা শক্তিশূন্যের সমাহার। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে একটি আবদ্ধ বস্তুর অভ্যন্তরে সঠিক বা স্থির স্পন্দনের সংখ্যা গণনা করা হয়। এবং এই গণনার সময় ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব ব্যবহার করা হয় যেখানে বলা হয় যে, বিকিরণ তরঙ্গ-প্রকৃতির অর্থাৎ অবিশ্লিষ্ট। সুতরাং প্রাংকের সমীকরণ একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি, যার মধ্যে এক অংশে রয়েছে কণা বা ফোটনের ধারণা এবং অন্য অংশে রয়েছে তরঙ্গের বা স্থির স্পন্দনের ধারণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিকিরণ তত্ত্ব পড়বার সময় সত্যেন বসুর চোখে এই যৌক্তিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

এক অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে সত্যেন বসু এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, এই আলোককণাগুলি সব একই ধরনের। অর্থাৎ তারা সব অদৃশ্য, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। এটাও চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের পরিপন্থী ধারণা, কেননা এত দিন আমরা জেনে এসেছি যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সব বস্তুকণা বিভিন্ন— তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। সত্যেন বসু ধারণা করলেন যে, কোয়ান্টাম জগতে এই পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ আর সম্ভব নয় এবং এখানে তাঁর ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সত্যেন বসুর আর একটি অনুপ্রাণিত অনুমান ছিল যে, কোয়ান্টাম বস্তুকণার দশাজগতের ক্ষুদ্রতম আয়তন শূন্য হতে পারে না। কোয়ান্টাম কণার ক্ষুদ্রতম দশা-আয়তন হল প্রাংকের ধ্রুবকের ত্রিঘাত। আমরা আজকাল জানি যে, হাইসেনবার্গের

অনির্দেশ্যতার নীতি আসলে একথাই বলে, কিন্তু সত্যেন বসুর সময় তা জানা ছিল না। সত্যেন বসুর কাছে এটা ছিল একটা অসমসাহসিক অনুমান।

সত্যেন বসু আরো একটা অনুমান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ফোটন কণার দৃষ্টি মাত্র সমবর্তন দশা আছে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে তিনি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আসলে ভরহীন বস্তুকণার জন্যে দলতত্ত্বের ব্যবহার ছাড়া এটা ব্যাখ্যা করা যায়ও না এবং অনেক দিন পরে ভিগনার সার্থকভাবে দলতত্ত্ব দিয়ে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

প্রাংকের সমীকরণ নির্ধারণের জন্যে সত্যেন বসুর প্রয়োজন হয়েছিল একটা কোয়ান্টাম অবস্থার তাপীয় সম্ভাবনা গণনা করা। তাকে ১৯৭৪ সালে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি এত কঠিনেট্রিক্স কোথায় শিখেছিলেন?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি গণিতের ছাত্র ছিলাম এবং প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে অনেক কিছু শিখেছিলাম।'

সত্যেন বসু তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি প্রথমে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জার্নাল ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে পাঠান, কিন্তু ছয় মাস পর তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। ঐ ম্যাগাজিনের রেফারি তাঁর প্রবন্ধের মূলকথা ধরতেই পারেননি বলে মনে হয়। কিন্তু নিরাশ না হয়ে সত্যেন বসু ১৯২৪ সালের জুন মাসে প্রবন্ধটি আইনস্টাইনের কাছে পাঠান এবং লেখেন, 'আপনি দেখবেন যে প্রাংকের সমীকরণের উৎপাদকটি আমি চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব ব্যবহার না করে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি। শুধু অনুমান করেছি যে, দশাভাগত্বের সূদ্রতম অংশ হল প্রাংক প্রবন্ধের ত্রিঘাত।' ঐ সময়ে পৃথিবীতে বোধ হয় আইনস্টাইনই একমাত্র ব্যক্তি যার কাছে সত্যেন বসুর এই অনুমানের তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হতে পারত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধটি অনুবাদ করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একথাও প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন যে, বসুর নির্ধারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এবং তিনি নিজে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ভারি বস্তুকণার দশাসমীকরণ কি পাওয়া যায় তা দেখাবেন। এভাবেই জন্ম নেয় বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব।

এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যেন বসু নিজে তাঁর পদ্ধতির গুরুত্ব বোঝেননি। বহুদিন পরে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার ধারণাই ছিল না যে আমি যা করেছি তা নতুন কিছু।' ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে বসুর দেখা হয়। আইনস্টাইন ঐ সময় হাইসেনবার্গ, শ্রয়ডিঞ্জার, ডিরাকের আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। আইনস্টাইন সত্যেন বসুকে এই নতুন বলবিজ্ঞান ব্যবহার করে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্বের 'প্রকৃত অর্থ' আবিষ্কার করতে বলেন। সত্যেন বসু অবশ্য একাজ করতে পারেননি। ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দিয়ে এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করেন। সমাধান এই যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তরঙ্গ-অপেক্ষক হল একটি কোয়ান্টাম দশার সম্ভাবনা, বিস্তার। সুতরাং তা প্রতিসাম্যের অথবা বিপরীত প্রতিসাম্যের হতে পারে। অর্থাৎ দুটো বস্তুকণা যারা বসুর ধারণা অনুসারে সদৃশ— তাদের মধ্যে বদলাবদলি করা হলে তরঙ্গ-অপেক্ষক একই থাকতে পারে অথবা একটি বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে গুণ হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে তরঙ্গ-অপেক্ষক হল প্রতিসাম্যের এবং যেসব বস্তুকণার জন্যে

প্রতিসাম্যের তরঙ্গ অপেক্ষক ব্যবহার করতে হয়, বসুর নাম অনুসারে তাদের বলে বসু কণা বা বোসন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তরঙ্গ অপেক্ষক হল বিপরীত প্রতিসাম্যের এবং যেসব বস্তুকণার জন্য এই ধরনের তরঙ্গ-অপেক্ষক ব্যবহার করতে হয়, ফার্মিওন নামানুসারে তাদের বলা হয় ফার্মিয়ন। এভাবেই সত্যেন বসুর নাম চিরকালের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সত্যেন বসু জীবনের সব কিছু যে সহজে পেয়েছিলেন, তা নয়। যদিও তিনি ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন এবং পরে বি.এসসি. (সম্মান) এবং এম.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন তবুও তিনি কোন চাকরি সঙ্গে সঙ্গেই পাননি। তিনি এক বছর প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে জীবনধারণ করেন এবং তারপরে পাটনা কলেজে একটি চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু তাকে বলা হয় যে, তারা একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এসসি. খুঁজছেন। এরপর তিনি আলীপুরের আবহাওয়া দফতরে চেষ্টা করেন, কিন্তু 'বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য সেখানে কোন চাকরি খালি ছিল না।

১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে প্রভাষক নিযুক্ত হন, কিন্তু এ সময়ে কোন পরীক্ষায় একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নের জন্য সব ছাত্রকে পুরো মার্কস দেয়ার দাবি করলে তিনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনেন, কেননা প্রশ্নকর্তা ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর আর্ডেইস মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। বোধ হয় এ কারণেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য দরখাস্ত করলে আশু মুখুজে কোন আপত্তি করেননি।

নতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত আবহাওয়া সত্যেন বসুর ব্যতিক্রমী প্রতিভা স্মরণের পক্ষে নিঃসন্দেহে উপযুক্ত ছিল। তিনি আইনস্টাইনের কাছে তাঁর প্রবন্ধ পাঠাবার কিছু দিন পরেই ইউরোপ যান এবং ১৯২৪-২৫ এই দুই বছর প্যারিসে কাটান। এ সময় তিনি পি লাঞ্জের, মাদাম কুরি মরিস এবং লুই দ্য ব্রগলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর লাজুক প্রকৃতি তাকে এদের সঙ্গে একত্রে গবেষণা করতে দেয়নি। তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন কিন্তু আইনস্টাইন তত দিনে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্বের ওপর যা কিছু করার শেষ করে তাঁর একীভূত তত্ত্বের কাজে ফিরে গিয়েছেন। তাই বসুর স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি।

ঢাকায় ফিরে সত্যেন বসু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে ব্রতি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এর আগে বা এর পরে আর কখনো এত উঁচুতে ওঠেনি। কিন্তু, তবু ১৯৪৫ সালে বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হন। মোটে ৫১ বছর বয়সে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিতে হয়।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। তারপর দু'বছর তিনি বিশ্বভারতীর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং ১৯৫৯ সালে তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন।

১৯৫৪ সালে সত্যেন বসু ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৮ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। যদিও এই সম্মান তাঁর অনেক

আগেই পাওয়া উচিত ছিল। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সত্যেন বসু তাঁর অশীতিতম জন্মদিবসের কয়েক দিন পরেই লোকান্তরিত হন।

যদিও পদার্থবিজ্ঞান, গণিত এবং সংখ্যাতত্ত্বে গবেষণা সত্যেন বসুর প্রধান আকর্ষণ ছিল, তবু তিনি সারাজীবন সাহিত্য, ইতিহাস এবং সঙ্গীতচর্চা করে গিয়েছেন। তিনি এপ্রাজ বাজাতে পছন্দ করতেন যেমন তাঁর গুরু আইনস্টাইন বাজাতেন বেহালা। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন বসু স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং প্যারিসে থাকাকালে ইউরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের তিনি একজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থটি সত্যেন বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্ভব হবে কি?' তাঁর উত্তর ছিল, 'যাঁরা বলেন যে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া যায় না, তাঁরা হয় এই ভাষা জানেন না অথবা তাঁরা বিজ্ঞান জানেন না।'

এটাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রেখে যাওয়া আমাদের সত্যেন বসুর অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য।

কাজী মোতাহার হোসেন, সংখ্যায়নের মোতিহার

কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আমার প্রথম কথা বলার ঘটনাটি এখনও মনে পড়ে। কাজী সাহেব তখন গণিত বিভাগের শিক্ষক। আমি এম.এসসি. পড়ি পদার্থবিজ্ঞানে। সে সময় সলিমুল্লাহ হল বার্ষিকীর জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বিষয় ছিল 'কোয়ান্টাম লেবিদ্যার দার্শনিক পটভূমি।' প্রবন্ধটি পড়ে কাজী সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। মনে আছে, কাজী সাহেব হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন যে, এটাই পদার্থবিজ্ঞানে এপিস্টেমলজিকাল ধারণার ওপর শেষ কথা কিনা।

ঐ সময় কাজী সাহেবের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু যাকা শহরে অন্তত একজন মানুষের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা যায় দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল। আসলে কাজী সাহেবের চিন্তামানসের দার্শনিক দিকটির ওপর খুব বেশি আলোকপাত করা যায় না, কেননা এ ব্যাপারে তাঁর লেখা কোন প্রবন্ধ আমার চোখে পড়েনি। তবে কাজী মোতাহার হোসেন বাঙালি মুসলমান সমাজের নবজাগরণের অগ্রদূতদের একজন, একথা নির্দিষ্ট বলা চলে। শিক্ষা-দীক্ষাহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজের দুর্দশা যেসব মানুষকে বিচলিত করেছিল নিঃসন্দেহে কাজী সাহেব তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হিন্দুসমাজে যে নবজাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল মুসলমান সমাজে তার ঢেউ আসতে প্রায় একশ' বছর লেগেছে এবং কাজী নজরুল ইসলাম যদি এই মুসলিম জাগরণের চারণ কবি হন, তবে কাজী মোতাহার হোসেন তার প্রথম পথিকৃৎ বিজ্ঞানসাধক। এই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাঙালি মুসলমান সমাজে মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা যেভাবে নিয়ে এসেছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে তাঁদের বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁর স্রষ্টা বলা চলে।

কাজী মোতাহার হোসেনে (১৮৯৭-১৯৮১) সুদীর্ঘ জীবনের কর্মসাধনার প্রেরণাই ছিল মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধির প্রসার। পেশায় বিজ্ঞানী হলেও কাজী সাহেব ছিলেন উদার সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে আক্রান্ত হতে দেখে তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রথমেই এগিয়ে এসেছিলেন। সমসাময়িক অনেকের মতো তিনি শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ওঠাতে চাননি। মনে রাখা দরকার তথাকথিত প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই যখন পাকিস্তান ব্যুরো অর ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশনের অর্থানুকূল্যে পাকিস্তানি আদর্শের প্রচার কাজে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে নেমে পড়েছেন, তখনও এই সাধারণ পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়া মানুষটি বাঙালি সংস্কৃতির মূর্তিমান প্রতিভূ হিসেবে আমাদের মতো তরুণদের মনে আশার আলো জাগিয়ে রেখেছিলেন। আজীবন তিনি নির্ভয়ে দ্ব্যর্থহীন

ভাষায় অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জীবনবোধের প্রতিনিধিত্ব করে গিয়েছেন। কাজী সাহেবের সঙ্গে করাচি, লাহোর, পেশোয়ারে বিজ্ঞান সম্মেলনে যাওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রত্যেক জায়গাতেই দেখেছি, তাঁর সেই আত্মভোলা সহজ-সরল বেশভূষা যা কট্টর বাঙালি-বিদ্রোহীকেও মুগ্ধ না করে পারত না। ঐ সব সময় কেবলই আমার মনে হত, আমাদের কাজী সাহেব ছিলেন 'আনঅফিসিয়াল এমবাসাদর অব আংলাদেশ'। মনে আছে একবার কাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি ইকবাল সন্দেহ কি মনে করেন? কাজী সাহেব বলেছিলেন, 'আমাদের বাংলা সাহিত্যে ইকবালের মতো শায়েরদের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।' ইকবালকে তিনি স্বভাব কবি বলে মনে করতেন না এবং তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রে জোর করে ইকবালকে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রাচেষ্টাকে তিনি সাধ্যমতো প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন।

কাজী মোতাহার হোসেনের ঢাকা অবশ্যই ইতালির ফ্লোরেন্স ছিল না, যেখানে হিউ ট্রেভররোপারের কথামতো সৃষ্টি হয়েছিল 'বিশ্বের একটি নতুন ছবি এবং সেখানে মানুষের অবস্থান'। পশ্চাৎপদ মুসলমান সাম্রাজ্যের বহুমূল ধারণাগুলিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করা কাজী সাহেবদের মতো আলোকপ্রাপ্ত মানুষদের পক্ষেও সবসময় সম্ভব ছিল না। যে কঠিন সামন্ত্যতান্ত্রিক মূল্যবোধ মুসলমান সমাজকে আটপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল তার লৌহনিগড় ভেঙে ফেলা কাজী নজরুল ইসলাম এবং কাজী মোতাহার হোসেনদের এক প্রজন্মের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তবু তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে।

কাজী মোতাহার হোসেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুষ্টিয়া জেলার লক্ষীপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই তারিখে। তাঁর পিতা কাজী গওহরউদ্দীন আহমেদ ভূমিরাজস্ব বিভাগে চাকরি করতেন। চার ভাই এবং চার বোনের মধ্যে মোতাহার হোসেন ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

কাজী গওহরউদ্দীন অবসর সময়ে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং মসজিদের ইমামতী করতেন। মোতাহার হোসেনের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর পৈতৃক গ্রাম ফরিদপুরের বাগমারায় পারিবারিক পাঠশালায়। এই বাগমারা নিম্ন প্রাথমিক স্কুল থেকে ১৯০৭ সালে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি মাসিক দু'টাকা হারে বৃত্তি পান। এরপর তিনি কুষ্টিয়া জেলার সেনগ্রাম মাইনর স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯০৯ সালে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় তিন টাকা বৃত্তি পেয়ে তিনি পাস করেন। তারপর ১৯১১ সালে মাইনর পরীক্ষাতে তিনি চার টাকা বৃত্তি পান। মাইনর পাস করার পর তিনি ভর্তি হন কুষ্টিয়া হাই স্কুলে এবং সেখান থেকে ১৯১৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। এই পরীক্ষায় তিনি চারটি লেটারসহ রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হয়ে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পান।

মেধাবী ছাত্র হিসেবে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কোন একজন শিক্ষকের আচরণে খুঁকি হয়ে তিনি পরে রাজশাহী সরকারি কলেজে চলে আসেন। সেখান থেকে তিনি ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে

উ.এসসি. পরীক্ষায় বৃত্তি সহ পাস করেন। এরপর তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. অনার্স পরীক্ষা পাস করেন এবং ১৯২১ সালে ঐ কলেজ থেকেই পদার্থবিদ্যায় এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই দুই পরীক্ষাতেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন।



কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিবস ১ জুলাই ১৯২১ তারিখে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ডেমোনস্ট্রেটরের পদে নিয়োগ লাভ করেন— যখন তাঁর এম.এ. পরীক্ষার ফলই প্রকাশ হয়নি। তাঁর এম.এ. পড়বার সময়ের কথা তিনি এভাবে লিখেছেন, 'কিছুদিন আগে থেকেই আমার বৃত্তির সব টাকা বাপ-মায়ের ভরণ-পোষনের জন্য বাড়িতে পাঠাতে হত, আর আমি প্রাইভেট টিউশনি করে বিশ-পঁচিশ টাকা যা পেতাম তাই নিয়েই নিজের খরচ-খরচা চালাতাম।'

কাজী মোতাহার হোসেন যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন তখন সে বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. ডব্লিউ.এ. জেনকিনস এবং বিভাগের রিডার ছিলেন কলকাতা থেকে সদ্য আগত তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। জেনকিনস এবং বসু দু'জনেই কাজী সাহেবকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং সত্যেন বসুর প্রেরণাই তাঁকে সংখ্যাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ত্রিশের দশকে কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপন করেন এবং সত্যেন বসুর বিশেষ বন্ধু মহলানবীশের কাছে পরিণত হন। শিখতে কাজী সাহেবকে তাই কলকাতায় যেতে হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি ইন্সটিটিউট থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং ১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিলিস্ত গণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় থেকেই তিনি

পরবর্তীকালে মহলানবীশের নিমন্ত্রণে এই ইন্সটিটিউটে প্রতিবছর কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি. (কৃষি) শিক্ষাক্রমে পরিসংখ্যান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্ব কাজী সাহেবের। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি পরিসংখ্যান বিষয়ে ঋণকালীন শিক্ষক ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি সম্মান শ্রেণীতে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন এবং এখানে তাঁর বিষয় ছিল ধ্রুপদী। র্যালের 'থিওরি অব সাউন্ড' নামক গ্রন্থটি তিনি যত্ন করে শিখেছিলেন। ১৯৪৯ সালে গণিত বিভাগের নাম হয় 'গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগ' এবং ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে সেটি বিভক্ত করে সৃষ্টি করা হয় পরিসংখ্যান বিভাগ। কাজী সাহেব হলেন এই নব প্রতিষ্ঠিত বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান ও রিডার।

এই ১৯৫০ সালেই কাজী মোতাহার হোসেন পরিসংখ্যান বিষয়ে পি.এইচডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এই ডিগ্রি অর্জনে সত্যেন বসুর অবদানের কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। সত্যেন বসু যখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন তখনই ভারতীয় পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউট 'ব্যালান্সড ইনকমপ্লিট ব্রক জিজাইন' বা অসম্পূর্ণ ছক-নকশা নিয়ে গবেষণা চলছিল। সত্যেন বসু নিজেও এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কাজী সাহেবের নিজের কথায়, 'বাংলায় বলতে গেলে গবেষণার বিষয় হচ্ছে অসম্পূর্ণ শ্রেণীসংস্থান ব্যাপারে সুডৌল প্রকল্প। আমি একদিন সত্যেন বাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি ভুলনির্ভুল বিচারী পদ্ধতিতে (ট্রায়াল মেথোড) কয়েকটি সুডৌল অসম্পূর্ণ সারি সংস্থাপন (ব্যালান্সড ইনকমপ্লিট ব্রক ডিজাইন) সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে তার সংখ্যা গননা করতে চাই।' 'যাঃ যাঃ পাগলা, এত খাটনি করতে পারবি?' এরপর আমি ছয় মাস পর্যন্ত একাজে লেগে থেকে মোট সাতাশটি সমাধান পেলাম। সংস্থানটা ছিল পনেরটা সারি, পনেরটা বিভিন্ন কাজ, প্রত্যেক সারিতে ছয়টি করে বিভিন্ন জাত, প্রত্যেক জাত ছয়টা সারিতে থাকবে আর প্রত্যেক জোড়া সারিতে দুইটা সাধারণ জাত থাকবে। সত্যেনবাবুও এ সময় অনেকটা এই ধরনের কাজ করছিলেন। এবারে তাড়িয়ে দিলেন না। খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন। তাঁর খুশি দেখে কে? থিসিসটা রেখে দিলেন, বাড়ি গিয়ে আবার দেখবেন। পরদিন বললেন, 'দেখ, এই সাতাশটা কিন্তু বিভিন্ন সমাধান নাও হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থান আইসোমরফিক। হয়তো নাম বদল করে বিভিন্ন সাজে সেজেছে।' আমি ভাল করে খতিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম সত্যেন বাবু ঠিকই ধরেছেন। পরে শ্রেণীকরণ করে দেখা গেল তিনটি নন আইসোমরফিক বা প্রকৃতই বিভিন্ন সংস্থান রয়েছে। তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে আমার সমুদয় গবেষণাপত্রটি শুধরে দিলেন। এই গবেষণাপত্রের জন্য আমি ডক্টরেট পেয়েছিলাম। এর আদিতো ছিল সত্যেনবাবুর অসীম স্নেহ।'

তাঁর গবেষণাপত্রের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক ফিশার। তিনি বলেছিলেন,

'নতুন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যা প্রয়োগ করে তিনি এমন অনেক ফল পেয়েছেন যা আমি শুধু অনুমান করেছিলাম কিন্তু

প্রমাণ করতে পারিনি। পূর্বের যে কোন লেখকের তুলনায় তিনি এই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন।

ড. কাজী মোতাহার হোসেনের এই পদ্ধতি সংখ্যাতত্ত্বে এখন হোসেন-শৃঙ্খল নামে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই নিয়মটি ব্যবহার করে একই প্যারামিটার মানে অমেকগুলো সিমেন্টিকার ব্যালাসড ইনকমপ্লিট ব্লক উজ্জাইন পাওয়া গেলে সেগুলি আসলে একই সমাধান না শুধু নাম বদল করে অন্যরূপ নিয়েছে, তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। মূলত একই সমাধান হলে এগুলোকে মাইসোসমরফিক বলে।

প্রথমদিকে ব্যাপারটির গুরুত্ব অতখানি বুঝতে পারিনি। ফিশার সাহেবের অতিরিক্ত প্রশংসায় খটকা লেগেছিল। অনেক পরে বুঝেছিলাম, আমি যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করেছিলাম অর্থাৎ চেইন রুল সেটিকেই তিনি নিউ মেথড বলেছেন। নিয়মটা হঠাৎ আমার খয়ালে এসেছিল। ফিশার সাহেব তৎক্ষণাৎ এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাব্যতা দেখতে পরেছিলেন— আমার দৃষ্টি অতদূর যায়নি।

১৯৫৩ সালে ড. কাজী মোতাহার হোসেন পরিসংখ্যান বিভাগে প্রফেসর নিযুক্ত হন এবং সাত বছর ঐ পদে কাজ করার পর তিনি ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে কাজী সাহেবকে নবপ্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রথম পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৯ সালে তাঁকে 'প্রফেসর ইমেরিটারস' এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রথম 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে নিয়োগ দান করেন।

১৯৭৬ সালের দিকে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটলে ড. কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যায়। পরে স্মৃতিশক্তি কিছুটা ফিরে আসে এবং এই সময় তিনি একদিন শেষবারের মতো তাঁর নাতনীর সঙ্গে কার্জন হলে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মনে আছে চেয়ারম্যানের ঘরে বসে তিনি এদিক-ওদিক গাফিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, 'ঐদিকে একটা পুকুর আছে না?' বোঝা যায়, তিনি ঢাকা হলের পুকুরের কথা মনে করছিলেন যেখানে তাঁর একটি পুত্র জলমগ্ন হয়ে মারা যায়।

১৯৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং ৯ অক্টোবর তারিখে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক স্বজন হারানোর বেদনা পেয়েছিলেন, কেননা প্রায় ষাট বছর যাবৎ কাজী সাহেব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি প্রতিষ্ঠান যার কোন তুলনা হয় না।

কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখলেও তিনি বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রথম সারির একজন সাহিত্যিক হিসেবেই অধিক পরিচিত। আজকাল প্রদেশে বিজ্ঞানে কোন গবেষণাকর্ম না করেও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হওয়া যায়। যাবার শুধু কিছু শব্দ কলসির আকারে সাঙালেও এদেশে কবি বলে বিখ্যাত হওয়া যায়। এই টেলিবিজ্ঞানী এবং কলসি কবিদের দেশে কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন একজন বৈরল ব্যতিক্রম। বিশেষ দশকে ঢাকায় যে বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে তার মুখপাত্র

ছিল 'শিখা' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা এবং সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরো কয়েকজন। কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন,

'কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব আমার স্বগ্রামের লোক। তিনি সাক্ষাৎভাবে আমার স্কুলের শিক্ষাদাতা না হলেও অনেকাংশে, বিশেষকরে চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে গুরুত্বান্বিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সময় ভ্রনাব আবুল হোসেন সাহেব ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হয়ে আসেন। এরা এবং আবদুল কাদির, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, শামসুল হুদা, আবদুস সালাম প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র মিলে ১৯২৬ সালে একটি মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠন করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' ছিল এই সমাজের মূলমন্ত্র। এই সময় একটা আল-মামুন সমিতিরও প্রতিষ্ঠা হয়। এইসব সমাজ বা সমিতির মিটিং-এ মুসলিম সমাজের প্রচলিত বহু চিন্তার বিরুদ্ধে পরম গরম প্রবন্ধ পাঠ করা হত। চিন্তাশীল ছাত্রেরা স্বভাবতই এতে উৎসাহী হয়ে উঠল। এই বছরেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়। এর পেছনে কর্ম শক্তি ছিল আবুল হোসেনের, চিন্তা শক্তি ছিল আবদুল ওদুদের, নৈতিক সমর্থন ছিল নবযুগের আর (কারো কারো মতে) হৃদয়শক্তি ছিল মোতাহার হোসেনের।'

শিখা, সওগাত, মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মধ্য থেকে কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে কাজী সাহেব প্রবন্ধ সংকলন 'সঞ্চরণ' প্রকাশ করেন ১৯৩৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরী বইটির প্রশংসা করেন। সঞ্চরণের 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' নামক প্রবন্ধ থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যায়।

'কবি ও বৈজ্ঞানিক দুই জনই সাধক, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এ দুয়ের সাধনা যেমন বিভিন্ন দৃষ্টি ও সৃষ্টিও তেমনি পৃথক।

কবির দৃষ্টিতে তিনি কেবল বস্তু বা ঘটনা নয়; এ সবার ভিতর দিয়ে কি যেন এক অস্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিত দেখতে পান। সে ইঙ্গিত অনেক সময় সাধারণ মানুষের মনের কল্পনাকেও আলোড়িত করে তোলে এবং কল্পনা উদ্ভুদ্ধও করে। সে কল্পনার ছায়ায় পৃথিবীর চিত্র বেশ স্নিগ্ধ মনোহর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। তখন পৃথিবীটা আর আমাদের নিত্যগোচর পৃথিবী থাকে না—কল্পনার স্বর্গে পরিণত হয়।

ওদিকে বৈজ্ঞানিক সচরাচর দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাকেই বিশেষভাবে পরখ করে দেখতে চান। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়াদির প্রাধান্য নেই।

বৈজ্ঞানিক বস্তু বা ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন, তাকে ছিন্নভিন্ন করে অশুদ্ধার সঙ্গে ফেলে দেবার জন্য নয়—তার ভিতরকার সত্যটি আবিষ্কার করে জগতের অন্যান্য সত্যের সঙ্গে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করে যথাযথভাবে গাঁথবার জন্যেই।

জগৎ এজন্য কবি ও বৈজ্ঞানিক দুই জনের নিকটই কৃতজ্ঞ।'

কাজী মোতাহার হোসেন প্রধানত সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পছন্দ করতেন। তাঁর 'সেই পথ লক্ষ্য করে' (১৯৫১), 'নজরুল কাব্য পরিচিতি'

(১৯৫৫), 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (১৯৭৯) প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন বাংলায় সম্ভব করার জন্য তিনি 'তথ্যগণিত' (১৯৬৯), 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' (১৯৭০) এবং 'আলোকবিজ্ঞান' (১৯৭৫) নামে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, কাজী মোতাহার হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সংঘলন উপলক্ষে ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় আসেন। দ্বিতীয়বার তিনি কাজী সাহেবের বাড়িতেই আড়াই মাস ছিলেন। কাজী সাহেব তখন সলিমুল্লাহ হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্তমান হাউসের দোতলায় কয়েকটি ঘরে পরিবার নিয়ে থাকতেন। কাজী সাহেবকে নিয়েই নজরুল 'দাড়িবিলাপ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। নজরুল তাঁকে 'মোতিহার' বলে ডাকতেন।

বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে কাজী সাহেবের যেমন দখল ছিল তেমনি তাঁর দখল ছিল টেনিস আর দাবা খেলায়। পরিণত বয়সেও তিনি কার্জন হল প্রাঙ্গণে টেনিস খেলতে আসতেন এবং আমাদের মতো তরুণদের অন্যায়সে পরাস্ত করতেন। তরুণ বয়সে তিনি হাইজাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডধারী হয়েছিলেন।

দাবা খেলায় কাজী মোতাহার হোসেন উপমহাদেশের একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। ১৯২৮ সালে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত দাবাড়ু কিয়ৎলালের সঙ্গে এক খেলায় ড্র করেন। প্রায় চার দশক ধরে তিনি বাংলা ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দাবা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি সাতবার সর্বভারতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের পৌরব অর্জন করেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী মোতাহার হোসেনের সবচেয়ে বড় পরিচয় বোধ হয় এই যে, তিনি এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সব সময়ই প্রথম সারিতে ছিলেন। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত ছিলেন। বাংলা ভাষায় আরবি হরফ চালু, রবীন্দ্রনাথের রচনা বর্জন ইত্যাদি পাকিস্তানি তৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। পাকিস্তানি আমলে ইকবালকে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হিসেবে হাজির করার অপপ্রয়াসকেও তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে পিছপা হননি। মনে রাখা দরকার যে, তিনি উর্দু আরবি ফার্সি ভালভাবেই লিখতে ও পড়তে পারতেন।

মানুষ হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন উদার হৃদয়, মানবপ্রেমিক এক রুচিশীল স্নিগ্ধ স্বভাবের ব্যক্তিত্ব। বাঙালি সংস্কৃতিবান মুসলমান বলতে যদি কোন ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তা অবশ্যই সৌম্যকান্তি কাজী মোতাহার হোসেনের। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু ধর্ম নিয়ে কোন সময় কারো সঙ্গে কোন মালোচনায় প্রবৃত্ত হতে তাঁকে দেখিনি। ধর্মকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে করতেন। এজন্যই তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিচার করতে পারতেন। তাঁর তরুণ

বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হীনমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা তাঁর মহান চরিত্রে কোন ছাপই ফেলতে পারেনি। তিনি বলেছেন,

‘একবার একটা ঘটনা ঘটল। একদিন নারায়ণগঞ্জে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম। পরদিন ফিরতে পথে শুনি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধে গেছে। ঢাকা স্টেশনে পৌঁছে আমি মুসলিম হলের ডঃ শহীদুল্লাহকে টেলিফোন করলাম নিরাপদে আমাকে হোস্টেলে নিয়ে আসতে। তখন মুসলিম হল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ। শহীদুল্লাহ সাহেব ছিলেন হাউস টিউটর। তিনি প্রথমে ডঃ হাসানকে অনুরোধ করলেন তাঁর মোটরে করে আমাকে নিয়ে আসতে। ডঃ হাসান না বলেছিলেন। তখন শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর বন্ধু রমেশ মজুমদারের কাছে গেলেন। উনি তৎক্ষণাৎ স্টেশনে গিয়ে মোটরযোগে আমাকে শহীদুল্লাহ সাহেবের গেটে পৌঁছে দিলেন। রমেশবাবু আর হাসানের মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্য কত এ থেকে বেশ বোঝা যায়।’ সত্যেন বসুর ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ‘সরাসরি আমার শিক্ষক না হলেও আমি দাবি করি আমিই সত্যেন বাবুর ছাত্রতম ছাত্র।’ সত্যেন বসু আর কাজী মোতাহার হোসেনের এই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, সমগ্র বাংলাভাষী জনগোষ্ঠির মহান ঐতিহ্যের অংশ।

কাজী সাহেব বলেছেন,

‘মা-বাবা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন জ্যোৎস্না রাতে মা-বাবা শুয়ে গল্প করছেন। আমি ঘুমের ভান করে চোখ বুজে আছি। মা বলছেন, কি সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না। বাবা বলে উঠলেন, ‘আল্লাহ আমাদের যে ছেলে পাঠিয়েছে তার কি তুলনা আছে? চাঁদের চেয়েও বেশি এটি।’

কাজী মোতাহার হোসেন সব সময়ই বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর পিতা-মাতার আকাজক্ষার চাঁদের চেয়েও বেশি বেঁচে থাকবেন।

মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, বিজ্ঞানসাধক ও সংগঠক

ড. কুদরাত-এ-খুদার কয়েকটি কথা সব সময়ই আমার মনে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক সিলেকশন কমিটির সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় সবাই তরুণ তাত্ত্বিকবিজ্ঞানী। দুঃখের বিষয় উপাচার্য, ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান সবাই তাত্ত্বিকবিজ্ঞানের বিরোধী। তাঁদের কথা হল এই যে, বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে এখন ফলিত গবেষণার প্রয়োজন বেশি। ড. কুদরাত-এ-খুদা সকলের বক্তব্যের শেষে ধীরে ধীরে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তা এখনও আমার মনে পুঁখে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে গবেষণা করা হয় তাকে তাত্ত্বিক বা ফলিত এভাবে ভাগ করা ঠিক নয়। আসলে এখানে সব পঠন-পাঠন এবং গবেষণা মূলত তাত্ত্বিক, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকের মেধা নিয়োজিত হবে জ্ঞানের পরিসীমা বাড়ানোর জন্য। নতুন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কাজ যদি ভাল হয় তবে একদিন না একদিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোথাও না কোথাও তার প্রয়োগ হবেই। ভাল কাজ যে করছে তাকেই উৎসাহ দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব— অন্য কিছু নয়।'

আমার মনে হয়েছিল কুদরাত-এ-খুদা সেদিন তাঁর সারাজীবনের বৈজ্ঞানিক কাজের পেছনে যে দর্শন ছিল সেটাই আমাদের মতো তরুণদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের গবেষণা সম্বন্ধেও এ ধরনের কথা ওঠে, তা তিনি জানতেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি রিং চেন টাউটোমেরিজম বা সেটিরও কেমিস্ট্রি নিয়ে যে কাজ করেছিলেন তা ছিল তাত্ত্বিক। তারপর সি.এস.আই.আর. গবেষণাগারে তিনি মাছ, ফল, চর্বি, কাঠি, মিষ্টি আলু, লেমন-ঘাস, দেশজ গাছ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে অসংখ্য কাজ করেছেন সেগুলি ছিল অরশাই ফলিত গবেষণা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? পাটের ওপর ক্ষারের বিক্রিয়া তাঁর ১৯৬৪ সালের কাজ। এটা ফলিত না তাত্ত্বিক গবেষণা এ প্রশ্ন বাস্তবিকপক্ষেই হাস্যকর। বাংলাদেশে যাঁরা ফলিত বা তাত্ত্বিক কোন গবেষণাই কোন দিন করেননি তাঁরাই এসব প্রশ্ন অহরহ তুলে থাকেন এবং এভাবে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে থাকেন।

মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে ১৯০০ সালের ১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় পিতা খোন্দকার আবদুল মুকিত কলকাতায় তালতলার পীর সাহেবের বাসায় ছিলেন এবং পীর সাহেবই নবজাতকের নামকরণ করেন। আবদুল মুকিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হলেও কোন দিন ব্রিটিশের চাকরি করেননি। কুদরাত-এ-খুদা তাঁর ছেটেবেলার কথা এভাবে বলেছেন,

‘আমরা ছিলাম পীর খান্দান। তবে বাবার মুরিদ সংখ্যা ছিল সীমিত। পরিবারের সবাই চাইতো আমি কোরানে হাফেজ হই। তাই ছোটবেলা থেকেই পবিত্র কোরান হেফজ করতে শুরু করলাম।

একদিন মজা হোল তখন গ্রীষ্মকালের ছুটি। আমার এক চাচাতো ভাই এলেন বাড়িতে। তিনি কলকাতার থেকে পড়াশোনা করতেন। আমায় তিনি এক পয়সা দিয়ে একখানা বর্ণবোধ কিনে দিলেন। সেদিন সকালে আমাকে অনেকগুলো পড়া করতে বললেন। দুপুরে দেখেন আমি খেলে বেড়াছি। আমায় ডাকলেন তিনি—‘এই হতভাগা দৌড়ে বেড়াচ্ছিস যে, পড়া হয়েছে? আমি বললাম, ‘হয়েছে’। তিনি বললেন, ‘আন দেখি’। আমি বই এনে গড় গড় করে সব বলে দিলাম। তিনি আমার বাংলা পড়ার অভিনিবেশ আর মেধা দেখে চমৎকৃত হলেন। বাড়িতে বললেন, আমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে তাঁর অনুরোধই আমার স্কুলের পাঠ শুরু হয়। বেশ বড় হয়ে আমি পড়াশুনা করি।

মাড়গ্রাম এম.এ. স্কুলে আমি ভর্তি হই। সেখানকার পণ্ডিতমশায় আমায় খুব ভালবাসতেন। তাঁর চেষ্টা ও ভালবাসায় আমি পর পর দু’বছর ডবল প্রমোশন পাই।

‘উনিশশ’ নয় কি দশ সালে আমি কলকাতায় যাই। সেখানে আমি উডবার্ন এম.ই. স্কুলে ভর্তি হই। ছাত্র প্রায় সবাই মুসলমান ছিল। পড়াশোনার মাধ্যম ছিল উর্দু। আর সেখানে প্রায় হৈ-চৈ বাঁধত উর্দুভাষী আর বাঙালিদের মধ্যে। স্কলারশিপ নিয়ে এম.ই. পাস করার পর আমি কলকাতার মাদ্রাসায় ভর্তি হই এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করি। সেটা ছিল ১৯১৮ সাল।

এরপর আরম্ভ হয় আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের জীবন। দীর্ঘ একটানা ছয় বছর। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই ১৯১৫ সালে আমি রসায়নবিদ্যায় এম.এসসি. পাস করি। কলেজ জীবনে আমায় সবচেয়ে বেদনা দিয়েছে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের প্রবল সাম্প্রদায়িক মনোভাব।

রেজাল্ট বের হবার সময় এক ঘটনা ঘটল। সহপাঠী অশোক সেন এসে জানালেন— খবর খুব ভাল। তুমি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছে। পরে শুনলাম এক গোল বেঁধেছে। আমাকে আর আমার এক সহপাঠীকে ব্রাকেটে প্রথম করার চেষ্টা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এক অধ্যাপক জানিয়েছিলেন আমার বন্ধু আমার থেকে একশত নম্বর কম পেয়েছিলেন। কিন্তু তার নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে আমার সমান করার চেষ্টা চলছিল। প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন স্যার পি.সি. রায়। তিনি তাঁদের বললেন, আরে ব্রাকেটে করতে চাও কিন্তু এ যে একশ নম্বরের ব্যবধান। এ কোন আইনে করবে? শেষ পর্যন্ত আমার শীর্ষ স্থান বহাল থাকল। তখন বিদেশে পড়ার জন্য ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো করে বৃত্তি দেয়া হতো। রাষ্ট্রীয় বৃত্তি। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়ি থেকে ‘তার’ করে এনে বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে বলেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আমার ভাগ্যে জোটে নি। স্যার আবদুর রহিম আমার কাছে সব শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট কাগজপত্র চেয়ে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত গলদ ধরা পড়ল। আমি বিদেশ যাবার বৃত্তি পেলাম।

সেখানে থিসিস শুরু করলাম জে. এফ. থরপ-এর নিকটে। তিনি প্রথম দিকে আমায় ভালো চোখে দেখেন নি। কারণ তিনি ছিলেন অভ্যন্ত পি.সি. রায় বিদ্যেখী। স্যার পি.সি. রায় একটা নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছিলেন বলে প্রফেসর থরপের এ বীতশ্রদ্ধা। আমি পি.সি. রায়ের ছাত্র তাই আমার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অবজ্ঞা। অপর ছাত্রদের তিনি থিসিসের আউটলাইন ও মূল বক্তব্যের ধারণাগুলো বলে দেন। কিন্তু আমার বেলায় তা করলেন না। বললেন, নিজে বুঝে স্বরচিত পথে কাজ করে যাও। এটা আমার শাপে বর হলো। নতুন পথে কাজ করতে করতে শেষে দেখা গেল আমি যা করেছি তা দিয়ে তিনটি থিসিস হয়। স্যার থরপ খুব খুশি হলেন। আমার এক-তৃতীয়াংশ কাজ সাবমিট করতে বললেন তিনি। ১৯২৯ সালে ডি.এসসি. নিয়ে দেশে ফিরলাম।



কিন্তু বিদেশী উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আড়াই বছর আমায় বসে থাকতে হয়। আমি ছিলাম একমাত্র মুসলমান ডি.এসসি. (ডক্টরেট অব সায়েন্স)। ডক্টর বর্ধনের অনুগ্রহে আমি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য আবেদন জানালাম এবং আমি একমাত্র মুসলিম ছাত্র যে এ বৃত্তি লাভ করেছিলাম। আড়াই বছর ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজে এ বৃত্তি নিয়ে আবার একটি থিসিস শুরু করলাম। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন লন্ডনের থিসিসই আমি পেশ করব। আগে তা করা যেত। সেবারই প্রথম নতুন আইন হলো পুরানো থিসিস সাবমিট করা যাবে না, কিন্তু নতুন থিসিসের কাজ লন্ডনেই আমার করা ছিল। তাই আমার স্কলার হতে কোন অসুবিধাই হলো না।

ড. কুদরাত-এ-খুদার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ১৯২৬ সালে লন্ডনের জার্নাল অব কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি কার্বোয়াক্সাইক্লোহেক্সেন

এসিটিক এসিড তৈরি করা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯২৯ সালে ঐ একই জার্নালে কার্বোয়ক্সি এসিটিল ডাইমিথাইল বিউটিরিক এসিডের রিং চেন টাউটোমেরিজম নিয়ে আলোচনা করেন। এর পরে এরা তিনটি প্রবন্ধে মোটামুটি ঐ একই বিষয়ের ওপর তাঁর পরবর্তী গবেষণালব্ধ ফলের বিবরণ দেন।

১৯৩০ সালের দিকে ড. খুদা ষ্টেরিওকেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সতের বছরে তিনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রিতে চৌদ্দটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকাতেও তিনি এ সময় 'স্ট্রেনলেন্স মনোসাইক্লিক রিং' এবং 'মাল্টিপেনার সাইক্লোহেক্সেন রিং' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রিং সিস্টেমের ওপর তিনি যে তত্ত্ব দিতে চেয়েছিলেন তা অবশ্য জৈব রসায়নশাস্ত্রে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর গবেষণার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না। রসায়ন শাস্ত্রের কোন শাখায় তাঁর যুগান্তকারী কোনে অবদানও নেই।' (জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭)। এ ধরনে মন্তব্য বিজ্ঞান গবেষণার মূল সূত্রটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকলেই করা যায়। বিজ্ঞানের অসংখ্য প্রথম সারির গবেষক বিশেষ বিশেষ ধারণা নিয়ে আজীবন কাজ করে যান সেসব ধারণার সবগুলিই যে সফল হয়, সার্থক হয়, তা নয়। কিন্তু তাই বলে তাদের মূল্য কম নয়। বিজ্ঞান স্বপ্নাদিষ্ট ব্যাপার নয় যে, আকস্মিকভাবে তা উদয় হয়। পৃথিবীব্যাপী সব বিজ্ঞানীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফল যে বিজ্ঞান সেখানে প্রত্যেকেই যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারেন না, কিন্তু প্রতিটি প্রয়াসের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে একজন নিউটন, আইনস্টাইন অথবা এমিল ফিশার।

সি.এস.আই.আর. গবেষণাগারের পরিচালক-সংগঠক হিসেবে ড. কুদরাত-এ-খুদা দেশজ সম্পদ নিয়ে গবেষণার দিকে জোর দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে তিনি বনৌষধি ও গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, কাঠকয়লা এবং মৃত্তিকা, লবণ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন। কবিরাজ ও হেকিমরা যে নাট্যকর ব্যবহার করেন এর থেকে তিনটি রাসায়নিক উপাদান তিনি বিগুহ অবস্থায় নিষ্কাশন করতে পেরেছিলেন। তেলাকুচা থেকে তিনি বারটি যৌগ পেয়েছিলেন যা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলসী, বিঘ কাঁটালী, গুলজ, কালমেঘ ইত্যাদি থেকেও তিনি জৈবপদার্থ নিষ্কাশন করেছিলেন যার ব্যবহার সম্ভব। পাটকাঠি থেকে মগু তৈরির প্রক্রিয়াও সি.এস.আই.আর. গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়। পাঠখড়ি থেকে কাগজ তৈরি তাঁরই গবেষণার ফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ড. কুদরাত-এ-খুদা এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

'পাটকাঠি নানাভাবে পরীক্ষা করা গিয়েছে এবং ফলে মনে হয় শিল্পের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কতিপয় উপায়েই হতে পারে। পাটকাঠির শতকরা ৭৫ ভাগ একরূপ মণ্ডে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেই মণ্ড প্রয়োগে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দৃঢ় তক্তা প্রস্তুত করা গিয়েছে। এক সঙ্গে যে চেউতক্তা প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে মনে হয় একটি বিরাট শিল্প বিবর্তন সংঘটিত হবে। এর সাহায্যে অনুরূপ আরও অন্য দ্রব্যও তৈরি করা সম্ভব। তারপর পাটকাঠির বিশেষ প্রধায় উৎকৃষ্ট সেলিউলোজ মণ্ডে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এই

উপায়ে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই এরূপ মণ্ডে পরিণত হয় এবং ঐ মণ্ড থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন করা হয়েছে। এই কাগজ নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এর সাহায্যে যে প্যাকিং কাগজ তৈরি হয়েছে তাও অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

—সূতরাং পাটকাঠিকে আমাদের রূপালীকাঠি নাম দিলেও কিছু অত্যাক্তি করা হয় না।’

ড. কুদরাত-এ-খুদা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি করে দেশে ফিরলেও সহজে চাকরি পাননি। খাজা নাজিমুদ্দিন নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে, আজকাল ডি.এস.সি. ব্র্যাকবেরির মতো গণ্য গণ্য যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সে যাই হোক, ১৯৩১ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং পাঁচ বছর পরে তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৪২ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং চার বছর পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই ফিরে আসেন অধ্যক্ষ হয়ে।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করে ডি.পি.আই.-এর পদ গ্রহণ করেন। জনশিক্ষা দপ্তরের পরিচালকের পদে থাকার সময় সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না, কেননা স্কুলে উর্দু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে তিনি মতপ্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে তাঁকে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু করাচিতেও তাঁর জীবন আনন্দময় ছিল না। এক সময় তাঁর গৃহে রাতে ইট-পাটকেল পড়া শুরু হল এবং করাচিতে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন যা তাঁর জন্য মোটেই উপযুক্ত পদ ছিল না। ১৯৫৫ সালে তাঁকে পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই গবেষণাগারের পরিচালকের দায়িত্বে কর্মরত থেকে অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদাকে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু আইয়ুব-মোনায়েম খানের চক্রান্তে সেখান থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ড. কুদরাত-এ-খুদার কর্মজীবনের এক বিশেষভাবে স্মরণীয় অবদান। এই প্রথম বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি সার্বিক আলোচনা এবং তার ভবিষ্যৎ রূপরেখা সহজে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এক কর্মধারার সূত্রপাত করা হয়। কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বলা হয়েছিল, ‘উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশই আজ পর্যন্ত দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে নি। জনগণের কর্মদক্ষতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। কিভাবে আমরা এই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন সাধন করব তার ওপর আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি নির্ভর করছে। এ ক্ষেত্র তাৎপর্য এই যে, যারা উচ্চশিক্ষা থেকে লাভবান হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে তারা সমাজের যে স্তরেরই হোক না কেন সকলের জন্য

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অবশ্যই প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে এবং তার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা জাতীয়ভাবে সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারিনি। গত কয়েক বছর যাবৎ কোন কোন রাজনৈতিক দলের বদৌলতে যেভাবে ক্যাম্পাস ভায়েলেন্সের ফলে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে তাতে অনেকেই আজ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশাগ্রস্ত। বাংলাদেশের প্রতিভা তাই এখন আমেরিকার বিদ্যায়তনে পাড়ি জমাচ্ছে দলে দলে। এই অবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত থাকলে এদেশটি একটি মুখের দেশে পরিণত হবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ড. কুদরাত-এ-খুদা শুধু যে একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়। বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ছাড়া যে বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব হয় না একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ১৯৩৬ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদাকে তদানীন্তন বাংলা সরকার শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের দায়িত্ব দেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সপ্তাহে একটি নিবন্ধ পড়লেন, নাম 'শিক্ষার সাক্ষীকরণ'। সেখানে তিনি বলদণ্ডকণ্ঠে ঘোষণা করলেন শিক্ষা কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া।

ড. কুদরাত-এ-খুদার প্রকাশিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থের মধ্যে বিশেষকরে উল্লেখ করা যায়, 'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প' যা বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী' যা ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এছাড়াও তিনি অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন।

ড. কুদরাত-এ-খুদা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্যা বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তাঁকে তমঘা-ই-পাকিস্তান ও সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল নিরভিমান মানুষ ছিলেন। এক সময় তাঁকে 'ন্যাশনালিস্ট মুসলিম' বলে মুসলিম লীগপন্থীরা প্রচার করত— কেননা তিনি কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে একজন খাঁটি বাঙালি ছিলেন। দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তান আমলে এদেশে রবীন্দ্র সাহিত্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তার প্রতিবাদে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর পরিবারের ধর্মীয় প্রভাবও তাঁর ওপর যথেষ্ট পড়েছিল। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর তিনি কোরান শরীফ অনুবাদ করতেন।

পরিণত বয়সে ড. কুদরাত-এ-খুদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সালের ৪ অক্টোবর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ৩ নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। আজীবন বিজ্ঞান সাধক এবং মাতৃভাষার সেবক ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা একনিষ্ঠ জ্ঞান সাধনার যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথে পাথর হয়ে থাকবে।

সুব্রাহ্মণিয়ান চন্দ্রশেখর, সত্য ও সুন্দরের পূজারি

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সময় সুব্রাহ্মণিয়ান চন্দ্রশেখর যে বক্তৃতা দেন তাঁর শেষে তিনি বলেছিলেন,

কৃষ্ণবিবরের গাণিতিক তত্ত্ব একটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কিন্তু এর অনুশীলনের ফলে আমি প্রাচীন প্রবাদবাক্যের মৌলিক সত্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়েছি যে, 'সহজই হল সত্যের স্বাক্ষর' এবং 'সত্যের ঔজ্জ্বল্যই হল সৌন্দর্য'। 'সহজ', 'সত্য' এবং 'সৌন্দর্য' এসব কথা সাধারণত বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় না। সুন্দরের ধারণা এবং সারল্যের কল্পনা বিজ্ঞানে নেই বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু 'চন্দ্র' তাঁর সাম্প্রতিকতম 'সত্য এবং সুন্দর; বিজ্ঞানে সৌন্দর্যবোধ এবং অনুপ্রেরণা' গ্রন্থে বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যের প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, সুন্দরের মধ্যে পছন্দ করতে হলে সব বিজ্ঞানী বোধ হয় সুন্দরকেই বেছে নেন। বিজ্ঞান শুধু সত্যের অনুসন্ধান বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় সৌন্দর্যবোধ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আইনস্টাইন, ডিরাক এবং চন্দ্রশেখরের মতো সৌন্দর্যের পূজারি বিজ্ঞানী বারবার প্রমাণ করে গিয়েছেন।

চন্দ্র প্রথম সৌন্দর্যের সন্ধান পান সাদা-বামন তারার ভেত্রে। আমাদের সূর্যসহ বিশ্বের অগণিত তারার শক্তির উৎস হল অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন গ্যাসের জ্বলুনি। যখন এই কেন্দ্রীয় মিথস্ক্রিয়া শেষ হয়ে যায় তখনই ঘটে তারকার মৃত্যু। চন্দ্র উনিশ বছর বয়সে আবিষ্কার করেন যে, সব তারাই অন্তিম অবস্থায় সাদা-বামন হয়ে যায় না। শুধু সেইসব তারাই সাদা-বামন হয় যাদের ভর অল্প। এটাকেই বলে চন্দ্রশেখরের ভর-সীমানা। কিন্তু প্রশ্ন হল, বেশি ভরের ক্ষেত্রে কি হবে? এ ব্যাপারে চন্দ্র সেই উনিশ বছর বয়সেই লিখেছিলেন, '—অন্যান্য সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করতে হয়।' অন্যান্য সম্ভাবনার মধ্যে আসে নিউট্রন তারা (পালসার), দ্বৈততারা (বাইনারি) এবং সবশেষে চিররহস্যময় কৃষ্ণবিবর বা ব্ল্যাকহোল।

ঔজ্জ্বল্যের বিচারে সাদা তারার অবস্থান প্রধান ধারা বা মেইন সিকুয়েন্স তারার হার্টসগ্রাফ-রাসেল স্কেচচিত্রের বাঁদিকে। এদের পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা ৫০০ থেকে ৫০,০০০ ডিগ্রি কেলভিন হতে পারে। আকার এদের খুব ছোট—সূর্যের ব্যাসের শতাংশ বা তারও কম এদের ব্যাস। অর্থাৎ আকৃতিতে সাদা-বামন তারা প্রায় পৃথিবীর মতো। কিন্তু ভর এদের সূর্যের ভরের কাছাকাছি, তাই তাদের ঘনত্ব বিপুল। বস্তু যখন অতি ঘনসংবদ্ধ তখন তার ইলেকট্রনগণের সারা ইলেকট্রনগণ বলাগাইসেইভাবে ছোট বেড়িতে পারে না। এটাকেই বলে ডিজেনারেট বা অধঃপতিত ইলেকট্রন গ্যাস। সাদা-বামনের কেন্দ্রের

ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক কোটি থেকে দশ কোটি গ্রাম, এর তুলনায় আমাদের সূর্যের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র দেড়শ' গ্রাম।

এই বিপুল ঘনত্বের কারণ অবশ্য এই যে, কেন্দ্রীয় মিথস্ক্রিয়ার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে বহির্মুখী চাপ আর থাকে না এবং অন্যদিকে অভিকর্ষের সংকোচন অব্যাহতই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত অধঃপতিত ইলেক্ট্রন গ্যাসের চাপ এই সংকোচন রোধ করতে পারে। এভাবে সাদা তারার সৃষ্টি হয়। যে সব তারার ভর আমাদের সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ শুধু সেগুলোই সুস্থির সাদা-বামন হিসেবে দেখা দিতে পারে।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে, জানুয়ারি মাসে চন্দ্র লভনের অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির সভায় তাঁর উপযুক্ত ফল উপস্থাপন করেন। তাঁর আশা ছিল যে, তাঁর পথপ্রদর্শনকারী গবেষণা জ্যোতির্বিদ্যামহলে স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, সেই সময়কার সবচেয়ে প্রভাবশালী জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন চন্দ্রশেখরের গবেষণাকে স্বীকৃতি তো দিলেনই না বরং তার বিরোধীতা করতে শুরু করলেন প্রকাশ্যেই।

'চন্দ্র'র গবেষণা ছিল আদিক, কেননা কোয়ান্টাম বলবিদ্যাই ইলেক্ট্রনের ডিজেনারোট বা অধঃপতিত অবস্থার কথা বলে যার থেকে স্বাভাবিকভাবেই আসে সাদা-বামন তারার প্রান্তিক ভর। চন্দ্রশেখরের ভাষায়, 'আদর্শ সাদা-বামনের এটাই আমরা সর্বোচ্চ ভর বলে ধরতে পারি' কেননা অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের চাপ এর বেশি ভর সহ্য করতে পারে না।

অবশ্যই এডিংটন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন এই সর্বোচ্চ সীমার গভীর তাৎপর্য কেননা এর ফলেই সৃষ্টি হবে চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষ্ণবিবর যা তিনি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির ঐ সভাতেই এডিংটন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তারা থেকে বিকিরণ চলতেই থাকবে এবং সংকোচন অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্যাসার্ধ কয়েক কিলোমিটারে নেমে আসে। তখন অভিকর্ষ এত শক্তিশালী হবে যে, তার বিকিরণকে ধরে রাখবে এবং তার তারকায় অন্তিম শান্তি নেমে আসবে।'

কিন্তু তারপরই এডিংটন যা বললেন তাঁর মনের কল্পনা, কোন বৈজ্ঞানিক কথা নয়, 'আপেক্ষিক তত্ত্বের অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত চরম অর্থহীন বলে মনে হয়। তারকাকে রক্ষা করতে অনেক কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে। তারচেয়েও বেশি রক্ষাকবচ আমি চাই। আমার মনে এই ধরনের অর্থহীন ব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রাকৃতিক আইন নিশ্চয়ই আছে।'

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক ব্যবহারকে এডিংটন অর্থহীন বললেও আজকাল একথা কেউ বলে না, কেননা ঐ ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান। ১৯৩৪ সালে চন্দ্র যা বলেছিলেন তা আজ সকলেই বিশ্বাস করেন যে, 'একটা অল্প ভরের তারার জীবন বৃত্তান্ত একটা বৃহৎ ভরের তারার জীবন বৃত্তান্ত থেকে অনেক আলাদা। কারণ, অল্প ভরের তারার জন্য স্বাভাবিক সাদা-বামন পর্যায় তার সম্পূর্ণ বিলোপের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। বৃহৎ তারা সাদা-বামন পর্যায় দিয়ে যায় না এবং তাদের জন্য অন্য সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে হয়।'

'শ্বেতবামন' তারা বলতে আমরা কি বুঝি? সহজ ভাষায় বলা যায় যে, এ ধরনের

বা ইলেক্ট্রনের একটা বিশাল 'প্রাঞ্জমা' ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাঞ্জমা কি? কোন বস্তুকে গুণ করলে তা যদি আয়নায়িত হয়ে যায় অর্থাৎ ইলেক্ট্রনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে মরা আহিত বস্তুকণার এক সমাবেশ পাই। এটাকেই বলে প্রাঞ্জমা, যা তরল বা বায়বীয় (ইত) পদার্থের গুণস্বলিত। এই ধরনের সমশক্তির ইলেক্ট্রনগুলো সর্বোচ্চ ঘনত্বে জমাট য় থাকে। এই জমাট হওয়া এত দৃঢ় যে, শুধু কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পাউলির বর্জন-নীতি লঙ্ঘনগুলোকে আলাদা করে রাখতে পারে, কুলুম্ব আইনের বিকর্ষণ নয়। অতিঘন াতিঃপদার্থ বস্তুতে এ ধরনের প্রাঞ্জমা থাকতে পারে, যেমন অধঃপতিত (egenerate) তারকার অভ্যন্তরে। অধঃপতিত প্রাঞ্জমা উপস্থিত থাকতে পারে এমন রকায় যাদের ভর সূর্যভরের এক হাজার ভাগের মতো (সূর্যভর হল 1.989×10^{30} g)। এ ধরনের অল্প ভরের বস্তুর মধ্যে থাকে প্রধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। হলো এত উত্তপ্ত হতে পারে যে, যার ফলে তাদের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন জ্বলুনির পকেন্দ্রীয় (thermonuclear) বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। অন্যদিকে, যেসব বস্তুর সূর্যভরের ৮ শতাংশের অধিক তাদের সত্যিকারের তারকা বলা যায়। এসব তারকা প্রোজ্জ্বল, কারণ তাদের অভ্যন্তরে তাপকেন্দ্রীয় জ্বলুনি থাকে।



যেসব তারকার ভর সাত দশমাংশ থেকে এক সূর্যভরের মধ্যে তারা এত ধীরে ধীরে তে থাকে যে, তারা কখনই বিবর্তনের প্রধান ধারা (Main sequence) বা হ্রোজেন জ্বলুনি পর্যায় থেকে বাইরে যায় না। ছায়াপথে তাদের সমগ্র জীবনকাল হল হাজার থেকে দুই হাজার কোটি বছর।

যেসব তারকার প্রাথমিক ভর এক সূর্যভরের বেশি তাদের হাইড্রোজেন জ্বলুনি তাদের অভ্যন্তর ভাগ অধঃপতিত অবস্থায় পৌছানোর আগেই শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এদের অভ্যন্তরভাগ সংকুচিত হতে থাকে এবং তারপর হিলিয়াম জ্বলুনির তাপকেন্দ্রীয় বিক্রিয়া শুরু হয় যখন কেন্দ্রের চাপ এবং ঘনত্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তারকা বিবর্তনের এই পরবর্তী পর্যায় প্রাথমিক হাইড্রোজেন জ্বলুনি পর্যায় থেকে দ্রুতভর। বিবর্তনের এই পর্যায়ে তারকা সক্রিয়ভাবে তার ভর পরিত্যাগ করতে পারে। যেসব তারার প্রাথমিক ভর এক থেকে ছয় বা আট সূর্যভর, তারা তাদের ভর এমন যথেষ্ট পরিমাণে পরিত্যাগ করতে পারে যাতে তাদের সক্রিয়, কেন্দ্রীয়-জ্বলুনি জীবনকাল শেষ হয়ে যায়। এসব তারকাকই বলে শ্বেতবামন— যাদের ভর গড়ে সূর্যভরের পাঁচ-ছয় দশমাংশ। শ্বেতবামন তারকা তাই এমন সব জ্যোতিঃপদার্থ যা তাদের অভ্যন্তরের অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের চাপের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। শ্বেতবামনের সর্বোচ্চ ভর হল চন্দ্রশেখরের সীমানা যা ১.৪ সূর্যভরের সমান। এ ধরনের তারকার অভ্যন্তরের হিলিয়াম বা তার চেয়ে ভারি মৌলিক পদার্থ থাকে।

যেসব তারকার ভর সূর্যভরের আট গুণের বেশি তারা তাদের জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে ভর পরিত্যাগ করতে পারে না— যাতে তারা শ্বেতবামন হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের তারার অভ্যন্তর ভাগ সংকুচিত হতে থাকে। তারা ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব এবং তাপের পর্যায় দিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে তাপকেন্দ্রীয় সংশ্লেষণ (fusion) বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে ভারি কেন্দ্রীয় তৈরি হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিক্রিয়া অভ্যন্তর ভাগকে লোহারে পরিবর্তিত করে দেয় কেননা লৌহ-কেন্দ্রীয়ের বাঁধনীশক্তি সবেচেয়ে বেশি। এর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় তাই আর অতিরিক্ত শক্তি নিঃসৃত হয় না। লৌহ কেন্দ্রস্থলে ভর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা চারপাশে কেন্দ্রীয়-জ্বলুনি-খোলস থেকে বস্তু প্রক্রিয়াজাত হয়ে অভ্যন্তরে আসে। কেন্দ্রস্থলের ভর ১.৪ সূর্যভরে অধিক হলে অধঃপতিত ইলেক্ট্রনের চাপ আর যথেষ্ট হয় না, যা দিয়ে অভিকর্ষের অধীনে তারকার চূপনিয়ে যাওয়া বন্ধ করা যায়। তার ফলে যে সর্ববিক্ষংসী ধসের সৃষ্টি হয় তাতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লৌহ অভ্যন্তরের ঘনত্ব কেন্দ্রীয় (nuclear) ঘনত্বের কাছে চলে আসে (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় 2×10^{18} গ্রাম)। এভাবে চূপসানোর ফলে যে অভিকর্ষ শক্তি নির্গত হয় তার ফলে তারকার বেশির ভাগই একটা বিশাল সুপারনোভা বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। এই ধরনের বিস্ফোরণ কয়েক বছর আগে Sanduleak ৬৯২০২ তারকার বিস্ফোরণে দেখা গিয়েছে, যা পরবর্তীকালে SN ১৯৮৭ নামে পরিচিত হয়েছে। বিস্ফোরণের পর তারকার অবশিষ্টাংশের ভর দুই বা তিন সূর্যভরের কম হলে তাকে বলে নিউট্রন তারকা। নিউট্রন তারার অভ্যন্তরে অধঃপতিত নিউট্রনের চাপের জন্যই তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। অন্যদিকে অতিবৃহৎ তারকার চূপসানো কেন্দ্রস্থলের ভর এত বেশি থাকে যে, তা দিয়ে স্থায়ী নিউট্রন তারকা গঠন করা যায় না এবং এগুলি খুব সত্ত্বত কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি করে— যা এত ঘন যে, তার মধ্যে থেকে আলোকও মুক্তি পেতে পারে না।

কিন্তু এডিংটনকে এ কথা বোঝানো সম্ভব ছিল না এবং তাই শেষ পর্যন্ত চন্দ্র এডিংটনের ইংল্যান্ড ভাগ করে চলে গেলেন আমেরিকায়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি মার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো করেছেন। একটি ক্ল্যাসিক গ্রন্থে সাদা-বামন তারা সম্বন্ধে মার গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করে তিনি অন্য কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি একটা করে তুন গবেষণার বিষয় ঠিক করেন, সে সম্বন্ধে কয়েক বছর কাজ করে একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ চনা করেন এবং তারপর আবার নতুন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সব বেষণাতেই থাকে ব্যাপক অনুসন্ধানের পরিচয়। আজকাল তাঁর সব কাজই ঐ বিষয়ের ওপর শেষ কথা, যেমন সাদা-বামনতারার ওপর তাঁর কাজ ছিল ঐ বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম কথা। তাঁর ঐ প্রথম কথা বুকতে পৃথিবীর অনেক সময় লেগেছে, কেননা বহুকাল পর্যন্ত সাদা-বামন তত্ত্বের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যেত না। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় তাঁর সাদা-বামন তারার ওপরের কাজের কথা উল্লেখ করা হয় 'যা তিনি তাঁর ঐশ বছর বয়সে করেছিলেন' এবং পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালের দিকে তিনি তারকার ন্যাপটিক তত্ত্বসম্বন্ধে অস্থিতিশীলতার ওপর যে কাজ করেন তারও উল্লেখ করা হয়।

আমেরিকার বিজ্ঞানের জন্য চন্দ্রের অবদান বিপুল। তাঁকে একবার একজন বিজ্ঞানী করেছিলেন, 'আপনার ক্লাসে নাকি ছাত্র মোট দু'জন?' চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, এবং ঐ দু'জন ছাত্র বেশ ভালই বোঝে বলে মনে হয়।' এই দু'জন ছাত্র ভবিষ্যতের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সি.এন. ইয়ং এবং টি.ডি.লি। উপমহাদেশের অন্য যে তনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা কেউই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছাত্র সৃষ্টি করতে পারেননি। শিক্ষক হিসেবে চন্দ্র অনন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এজন্যই চন্দ্রকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন।

চন্দ্র অবশ্য ভারতে আসার কথা চিন্তা যে করেননি, তা নয়। স্যার সি.ডি. রামন যিনি মুর পিতার ছোট ভাই এবং বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, তিনি চন্দ্রকে হকারী অধ্যাপকের পদে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় চন্দ্র শতাব্দীর পরামর্শে এই আমন্ত্রণ সঙ্গত কারণে গ্রহণ করেননি। তারপর ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মার জন্মস্থান লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদটি পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনও তিনি তাঁর বন্ধু এস. চৌলার জন্য ঐ পদটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলে তাঁকে কোদাইকানালা মানমন্দিরের ডিরেক্টর পদে নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু তিনি প্রশাসনিক কাজ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এবারেও তাঁর ভারতে আসা হল না।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ড. হোমি ভাবা চন্দ্রকে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ গবেষণাগারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। চন্দ্র প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এ সময়েই তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন, তাই আর তাঁর ভারতে চলে আসা হয়নি। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের খ্যাতি দেয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু চন্দ্র বলেছেন যে, এসবের মধ্যে হোমি

ভাবার প্রস্তাবই তাঁর বোধ হয় গ্রহণ করা উচিত ছিল কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি।

একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানে অভ্যন্তরীণ চেহারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং তার অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হত না। স্যার সি.ভি. রামন ও মেঘনাদ সাহার কলাহের কথা সকলেরই জানা এবং এর থেকে দূরে থাকা তিনি হয়তো শ্রেয় মনে করে থাকবেন। চন্দ্রের বন্ধু ছিলেন কে.এস. কৃষ্ণান যিনি রামন প্রক্রিয়ার মূল পরীক্ষণটি করেছিলেন তা তাঁর জানা ছিল। চন্দ্র হেমি ভাবাকে পছন্দ করতেন কিন্তু ভাবার এরিসটোটেলিস অনেকের মতো তাকেও পীড়িত করত। প্রশাসনিক কাজ তাঁর পছন্দ হত না, কিন্তু এই উপমহাদেশে প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত না থাকলে কোন ব্যক্তিই সম্মান পায় না। এই উপমহাদেশের ট্রাজেডি এটাই যে চন্দ্রের মতো আজও কেউ যদি শুধু গবেষণায় লিপ্ত থাকতে চান, প্রশাসনিক কাজে না জড়িত হতে চান তবে তাঁকে চন্দ্রের মতোই দেশভাগী হতে হবে। এটাই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ঐতিহ্য যা উপমহাদেশে আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলছি।

সাদা-বামন তত্ত্ব নিয়ে এডিংটনের সঙ্গে চন্দ্রের বিবাদ তাই শুধু বৈজ্ঞানিক একতা মনে করা ভুল। ইংল্যান্ড কোন দিনই ভাবেনি যে, এই উপমহাদেশের মানুষ বিজ্ঞান করতে পারে। তাই জগদীশচন্দ্র বসু ইংল্যান্ডে স্বীকৃতি পাননি, সত্যেন বসু রাদারফোর্ডের ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ পাননি এবং সুব্রাহ্মণিয়ান চন্দ্রশেখরকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে কোন আমন্ত্রণ করা হয়নি।

এডিংটনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের প্রসঙ্গে চন্দ্র লিখেছেন, 'এই ব্যাপারে এডিংটনের বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতি কি জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত। সহজ এবং সোজা উত্তর হল যে, তাঁর ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে ব্যাখ্যা করা যাবে না কিভাবে ভরসীমার অস্তিত্ব আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সূচিকর্মে অচ্ছেদ্যভাবে স্থান করে নিয়েছে। এই জ্যোতির্বিদ্যায় রয়েছে তারা বিবর্তনের জটিল নকশা, উচ্চ ঘনত্বের তারকার অভ্যন্তরে কেন্দ্রীন মিথস্ক্রিয়া এবং অভিকর্ষজনিত ধসে পড়া প্রক্রিয়া যার থেকে সৃষ্টি হয় সুপারনোভা ঘটনা এবং প্রায় একই ভরের নিউট্রন তারা ও কৃষ্ণবিবরের জন্ম। আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি, 'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের একজন প্রথম দিকের এবং জোরালো সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এডিংটনের কাছে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ছিল না যে, তারার বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষ্ণবিবর সৃষ্টি হতে পারে।'

বিজ্ঞানের ইতিহাস চন্দ্রের আবিষ্কারকেই স্বীকৃতি দিয়েছে— এটাই তাঁর এবং উপমহাদেশের গৌরব।

আবদুস সালাম-এক ব্যতিক্রমী বিশ্বব্যক্তিত্ব

বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে মহাবিস্ফোরণকে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন পটভূমির এক ব্যতিক্রমী বিন্দু বলা হয়ে থাকে। আবদুস সালামকেও বোধ হয় বিজ্ঞানের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে স্বল্প চয়েকজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর মাঝির্ভাব ঐ মহাবিস্ফোরণের মতোই যা সাধারণ নিয়ম-কনুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না— যমন ব্যাখ্যা করা যায় না গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল এবং আইনস্টাইনের মাঝির্ভাবকে।

গ্যালিলিও আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে পরীক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত অর্জন করতে হয়। নিউটন শিখিয়েছেন কিভাবে উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতির আইন চিহ্নিত করতে হয়। ম্যাক্সওয়েল দেখালেন কিভাবে বিভিন্ন আইনকে একত্রিত করা যায়। আইনস্টাইন এসবের সঙ্গে যোগ করলেন যুক্তমেধার ধারণা নির্মাণের অসম সাংসিকতা। বশেষে সালাম নিয়ে এলেন একীভূত তত্ত্ব সৃষ্টি করার রূপকথার চাবি-কাঠিটি— যা তদিন সব পদার্থবিজ্ঞানী খুঁজে বেড়িয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই পাঁচটি নাম গই সব সময়ই একসঙ্গেই উচ্চারিত হবে বলে মনে হয়।

আবদুস সালাম ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি পাঞ্জাবের কাং শহরে যে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেখানে আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও বিদ্যার্জনের প্রতি ছিল এক মীম প্রেরণা। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন 'সর্বকালের সবচেয়ে বেশি নম্বর' পেয়ে। তারপর লাহোর সরকারি কলেজের সব রীক্ষাতেও একইভাবে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখেন। তবু কেমব্রিজে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়া তাঁর কাছে ছিল একটা 'দৈব ঘটনা'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পাঞ্জাবের একজন রাজনৈতিক নেতা ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য একটি তহবিল সংগ্রহ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে ঐ অর্থ দয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ফলে ঐ তহবিল দিয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঁচটি বৃত্তি ঘোষণা করা হল, যার একটি পেলেন আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন, 'যেদিন আমি বৃত্তি পেলাম, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, সেদিনই আর একটি টেলিগ্রাম পেলাম যে, সেন্ট পলস কলেজে একটা অপ্রত্যাশিত খালি জায়গার সৃষ্টি হয়েছে'— যা না হলে তাঁর কেমব্রিজে যাওয়া সম্ভব হত না।

কেমব্রিজে সালাম গণিত ট্রাইপসের দ্বিতীয় অংশ এবং পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অংশ নিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় দুই বিষয়েই প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণী পাওয়ার জন্য তিনি কেমব্রিজের একজন ব্যাংকার। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী পাওয়া সত্ত্বেও কেমব্রিজের রীতি অনুযায়ী তিনি পরীক্ষণ-পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু

করলেন না, কেননা 'পরীক্ষণের কাজে যেসব গুণ প্রয়োজন তা আমার মোটেও ছিল না—
ধৈর্য ধরে জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করা— আমি বুঝেছিলাম যে আমাকে দিয়ে ওসব হবে
না।'

কিন্তু কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতি বিজ্ঞানের যে কঠিন সমস্যাটি তিনি সমাধান করলেন তার
জন্যও কম ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল না। এ সময়ে প্রচলিত তত্ত্বে এমন একটা অসঙ্গতি ছিল
যার ফলে ইলেক্ট্রনের ভর হয়ে যায় অসীম, বৈদ্যুতিক আধানও হয়ে যায় অসীম যা অবশ্যই
অসম্ভব। জুলিয়ান সুইংগার, রিচার্ড পাইনম্যান, সিনেট্রো টোমোনাগা এই অসুবিধা কিভাবে
দূর করা যায় তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরে রয়েছে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস
এবং তার মধ্যে যে প্রোটন-নিউট্রন কণা থাকে তাদের মধ্যে সক্রিয় কেন্দ্রীন-নলের তত্ত্ব
আরো জটিল। এখানেই দরকার হয় যেমন ক্ষেত্রতত্ত্বের এবং এই ক্ষেত্রতত্ত্বেও যে অসীম
রাশির উদ্ভব হয় তা দূর করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন সালাম। এই পদ্ধতিকে বলা
হয় পুনঃসাধারণীকরণ পদ্ধতি এবং মেসন ক্ষেত্রতত্ত্বে পুনঃসাধারণীকরণের প্রমাণ সালামই
প্রথম দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে ১৯৫৮ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হপকিনস পুরস্কারে
ভূষিত করে।

বিদেশে পুরস্কার পেলেও দেশে তাঁর বিশেষ সুবিধা হল না। দেশে ফিরে তিনি পাঞ্জাব
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁকে পরিস্কার বলে দিলেন
যে, তিনি এতদিন যে গবেষণা করেছেন এখন তা ভুলে যেতে পারেন, কেননা এখানে
গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সালামের পক্ষে গবেষণা না করা অসম্ভব। তাই
আবার তিনি কেমব্রিজে ফেলো হিসেবে ফিরে গেলেন। কেমব্রিজে এবং পরে লন্ডনের
ইম্পেরিয়াল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সালাম দ্রুত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের পুরোগামী
গবেষণায় তাঁর অনন্যসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হলেন। এ সময়েই কণা
পদার্থবিজ্ঞানে প্যারিটি-ভঙ্গন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং
তা ব্যাখ্যার জন্য সালাম দুই-অংশবিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্বের প্রস্তাব করেন যা প্রথমে
ওলফগাংগ পাউলির মতো বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী মেনে নিতে চাননি। কিন্তু আজ তা-ই
স্বীকৃত ব্যাখ্যা।

ষাটের দশকে সালাম কণাবিজ্ঞানে প্রতিসাম্য তত্ত্বের ওপর কাজ শুরু করেন যখন
জাপানের কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ এ সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর ছিলেন না।
এই সময়ে সালাম পরিমাপ তত্ত্বের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন। ১৯৬১
সালে একটি প্রবন্ধে সালাম এবং ওয়ার্ড লিখেছিলেন, 'ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার
অংশগুলো তাদের সঠিক প্রতিসাম্যের গুণসহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে— স্থানীয় পরিমাপ
রূপান্তরের মাধ্যমে।' স্থানীয় পরিমাপ তত্ত্ব ব্যবহার করে সালাম, গ্লাসহাও এবং ভাইনবার্গ
যে একীভূত ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার জন্যই
তাদের ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও সালাম অসংখ্য পুরস্কার
ও পদক পেয়েছেন এবং পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত
করেছেন।

সালামের বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে রয়েছে দুই অংশবিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্ব এবং ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটি-ভঙ্গন, ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক পরিমাপ একত্রীকরণ, ক্ষীণ আধানহীন প্রবাহ এবং 'ডব্লিউ ও ডোড' বস্তুকণার ভবিষ্যদ্বাণী, মৌলিক কণার প্রতিসাম্য যথা ইউনিটারি প্রতিসাম্য তত্ত্ব, পুনঃসাধারণীকরণ অথবা অসীম রাশি দূরীকরণ তত্ত্ব, অভিকর্ষ এবং প্রবল বিক্রিয়ায় দুই টেম্বর তত্ত্ব; ক্ষীণ বিদ্যুতের সঙ্গে প্রবল শক্তির একত্রীকরণ, পরম বা বিদ্যুৎ-কেন্দ্রীন একত্রীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রোটন-ভঙ্গন; পরম প্রতিসাম্য, বিশেষকরে পরম মহাকাশ এবং পরম ক্ষেত্রতত্ত্ব।



এইসব গবেষণায় সালামের সংক্রামক উৎসাহ কতখানি তা তাঁকে যারা বক্তৃগতভাবে জানেন তাঁর কোন দিন ভুলতে পারবেন না। ক্ষীণ-কেন্দ্রীন শক্তির ফলে একটি নিউট্রন ভেঙ্গে যায় একটি প্রোটন, একটি ইলেক্ট্রন ও একটি প্রতি-নিউট্রিনো কণায়। অন্য দিকে আমাদের অতি পরিচিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি সব আধানযুক্ত কণার মধ্যে সক্রিয়। এই দুটি শক্তিকে একত্রিত করা সহজ কাজ ছিল না এবং তাঁর ও গ্রাসহাও-ভাইনবার্গের সাফল্যে ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলও খুশি হতেন, কেননা তাঁদের এই কাজ একশ' বছর আগে বিদ্যুতের সঙ্গে চৌম্বকত্বের একত্রীকরণের মতোই অসাধারণ। প্রকৃতির সব শক্তিগুলো একত্রীকরণের আইনস্টাইনের চিরন্তন স্বপ্ন আজ আর শুধু স্বপ্নই নয়, পদার্থজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, সালাম-গ্রাসহাও-ভাইনবার্গের প্ররতিত পরিমাপ পদ্ধতিতেই এই পরম একত্রীকরণ একদিন সম্ভব হবে এবং সেই সুদিন আর হয়তো বেশি দূরে নয়।

কিন্তু সালামের অন্য আর একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া সম্বন্ধে একই আশাবাদ ব্যক্ত করা আজও সম্ভব নয়। ১৯৬১ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় বিজ্ঞান সম্মেলনে আবদুস

সালাম প্রথম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্রসেড শুরু করেন এবং বিগত তিরিশ বছর নিরলসভাবে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ প্রচার করে গিয়েছেন। ঐদিন তিনি ঢাকায় বলেছিলেন, ‘সমাজের কোন অংশের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ সমাজের জন্যই ক্ষুধা, বিরামহীন পরিশ্রম এবং আশু মৃত্যু যে দূরীভূত করা যায় এর ধারণা সম্পূর্ণ নতুন।’

নতুন ধারণা হল এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসংখ্য অবদান ব্যবহার করে যে কোন জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা আজ সম্ভব, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সালামের ভাষায়, ‘একটি আবেগময় সর্বগ্রাসী ইচ্ছা এবং সমাজের সর্বত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার পথে সব অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য তার প্রয়োগ করা।’ সালাম দুঃখ করে মাঝে মাঝেই বলতেন যে, অবস্থা দেখে মনে হয় না এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

আবদুস সালাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণা পোষণ করেছেন। এই সেদিনও ঢাকায় এসে তিনি জোরালো ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং ফলে বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জি.এন.পি.র শতকারা ১.১ ভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি এই প্রতিশ্রুতির কিছুটা বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেতে বাধ্য এবং সেজন্য আবদুস সালামের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীরা অবশ্য আবদুস সালামের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁর ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রের জন্য। ১৯৪৬ সালে তিনি এই ‘ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরিটিকাল ফিজিক্স’ স্থাপন করেন— যার পেছনে সক্রিয় ছিল তাঁর ইতালীয় বন্ধু পাউলো বুর্ডিনির কর্মপ্রেরণা এবং ইতালীয় সরকারের অপরিসীম মহানুভবতা। উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা ট্রিয়েস্ট আসেন সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে যা এর পূর্বে মোটেই সম্ভব হত না।

সালাম সম্ভবত তাঁর নিজের জীবন থেকেই এ ধরনের একটি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

সালাম বুঝেছিলেন যে, যদিও ছাত্র হিসেবে ঝাং-এর স্কুলে, লাহোর সরকারি কলেজে অথবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর বিন্ময়বর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তবু একথাও ঠিক যে, যথাসময়ে সুযোগ না পেলে পৃথিবীর এক কোণায় তাঁর প্রতিভাও সমাজের অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। ভাগ্যলক্ষীর বরপুত্র তিনি। পারিবারিক পরিবেশের ব্যাপারে তাঁর ভাগ্য ভালই ছিল, কেননা আধ্যাত্মিকতা এবং শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য। বিশাল সিন্ধু নদে একটি শাখা নদীর তীরে এক কৃষক সমাজের একজন নিম্নকর্মচারীর পুত্র আবদুস সালাম। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পর তাঁর পিতা তাঁকে পড়া হয়েছে বুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। এছাড়া তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন তাঁর মামা, যিনি পশ্চিম আফ্রিকার এক সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

সালামের চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ইসলামের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি কোরান পড়েছিলেন

এবং পরিণত বয়সেও তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ছাত্র হিসেবে ইংরেজি সাহিত্য পড়লেও তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল গণিত। কিন্তু যে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে তাঁর মতো মেধাবী তরুণের পক্ষে সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়াই ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকারি চাকরিতে নতুন নিয়োগ বন্ধ ছিল বলেই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কেমব্রিজ আসতে পেরেছিলেন।

কেমব্রিজ সালামকে মুগ্ধ করেছিল, বিশেষকরে সেন্ট জনস কলেজের ফুলের বাগানগুলোর সৌন্দর্য। পরবর্তীকালে তিনি ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও ট্রিনিটিকেই ব্রিটেনের সবচেয়ে ভাল কলেজ বলা হয়। কারণ তিনি মনে করতেন যে, ট্রিনিটির বাগানগুলো সেন্ট জনস-এর মতো মনোমুগ্ধকর নয়।

বিশেষ কোন কষ্ট না করেই সালাম র‍্যাংগলার হয়েছিলেন এবং তারপর ফেড হয়েলের পরামর্শে সালাম প্রাথমিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি কোর্স নিয়েছিলেন। কিন্তু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ক্যাভেনডিশ পরীক্ষাগারে সালামের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন পরীক্ষাগারে কাজ করার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। বহুকাল পরে তাঁর নোবেল পুরস্কার বক্তৃতায় তিনি পরীক্ষণ-পদার্থবিজ্ঞানীদের ভূমিসী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একজন অকৃতকার্য পরীক্ষণ-বিজ্ঞানী হিসেবে সব সময়ই আমি বিরাট পরীক্ষণ দলের পরিবেশমণ্ডলকে ঈর্ষার চোখে দেখেছি।' এবং পরীক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি তিনি আইনস্টাইনের কথা দিয়েই প্রকাশ করেছিলেন, 'পরীক্ষণজগতের কোন জ্ঞান শুধু যৌক্তিক চিন্তার মধ্য দিয়ে আসতে পারে না, বাস্তবের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে এবং সেখানেই শেষ হয়।'

কেমব্রিজে সালামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ ছিল তাত্ত্বিক-পদার্থবিজ্ঞানের একটা অসঙ্গতি দূর করা। এ পর্যন্ত তত্ত্বে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে ইলেক্ট্রনের গণনাকৃত অসীম ভর এবং অসীম বৈদ্যুতিক আধানকে সসীম করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়ান সুইংগার, রিচার্ড ফাইনম্যান এবং সিনিট্রো টোমোনাগা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বকে কিভাবে পারিমার্জিত করা যায় তা দেখিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় বলের মেসন তত্ত্বের ব্যাপারে এই একই কাজ করেছিলেন আবদুস সালাম। সুতরাং কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁর সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই এবং তাঁর এই ভালবাসা থেকে তিনি কখনও সরে দাঁড়াননি।

পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রত্যেকটির পেছনে রয়েছে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতি তাঁর এই ভালবাসা। এর প্রথমটি হল 'প্যারিটি-ভঙ্গন সংক্রান্ত'। পদার্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ঘটনা এবং তার দর্পন-প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই প্রতিসাম্যকেই বলে প্যারিটি-প্রতিসাম্য। একটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে যখন একটি ইলেক্ট্রন নির্গত হয় তখন একটি নিউট্রনো কণাও নির্গত হয়। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, গতির সাপেক্ষে নিউট্রনোের বা দিকে এবং ডানদিকে ঘূর্ণনের সম্ভাবনা একই। ১৯৫৬ সাল টি.ডি.লি এবং সি.এন. ইয়ং প্রস্তাব করেন যে, বাম ও ডানের এই সমার্থকতা

তা নয়। এটাই প্যারিটি সংরক্ষণহীনতার আইন যা পরে পরীক্ষণের মারফত সুপ্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু সংরক্ষণহীনতার সত্যিকারের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন সালাম। নিউট্রিনো ভরকণা ভরহীন বলেই তা শুধু একদিকে ঘোরে অর্থাৎ প্যারিটি লঙ্ঘিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাউলি সালামের এই ধারণা প্রথমে গ্রহণ করত প্রতুত ছিলেন না, কিন্তু পরে তিনিও তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

সালামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অবদান হল, মৌলিক কণাগুলোর শ্রেণীকরণের জন্য গণিতের দলতত্ত্ব ব্যবহার করা। সমস্যা হল এই যে, প্রকৃতিতে যেসব কণা পাওয়া যায় তার সবগুলোই কি মৌলিক? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ১৯৬০ সালে জাপানের ঞ্যেকজন পদার্থবিজ্ঞানী প্রথম ঐকতান প্রতিসাম্যের ধারণা প্রবর্তন করেন। তাঁদের প্রস্তাব হল যে, পরিচিত মৌলিক কণাগুলো আসলে আরো তিনটি মৌলিকতর কণা দিয়ে তৈরি, যাদের কোয়ার্ক নাম দেয়া হয়েছে। বোধ হয় প্রাচ্যমানের সহমর্মিতার জন্য সালামই প্রথম আজাপানি পদার্থবিজ্ঞানী যিনি এই ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুরূপার কোয়ার্কতত্ত্ব এই সেদিন তিন জন পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে এখন ঐকৃতি লাভ করেছে।

আবদুস সালামের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে অবশ্যই বিদ্যুৎ-চৌম্বক এবং নীণ-কেন্দ্রীন-বলের একত্রীকরণ তত্ত্বের উল্লেখ করতে হয়। এই তত্ত্বের যে অবিচ্ছেদ্য বংশ 'গেজ ইনভ্যারিয়ান্স' বা মাপ অপরিবর্তনের নীতি তার ব্যাপারেও উৎসাহী প্রথম দিকে হলেন সালামই। আগেই বলেছি ১৯৬০ সালের দিকে তিনি এবং ওয়ার্ড একটি প্রবন্ধে লেখেছিলেন, 'আমাদের মৌল স্বীকার্য এই যে, প্রবল, ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার বংশগুলো তাদের সঠিক প্রতিসাম্যের গুণসহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে (তাদের আপেক্ষিক ক্রির মধ্যে সম্পর্কের সূত্রসহ) এবং সব বস্তুরূপার মুক্ত ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান অপেক্ষকের তিশক্তির অংশে পানির পরিমাপ রূপান্তরের মাধ্যমেই সেটা করা সম্ভব হবে।' এই গুণীয় পরিমাপ রূপান্তরের কথা সালাম এবং ওয়ার্ডই প্রথম পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন এবং টাই আজকাল মৌলিক কণার তত্ত্বে মূল ধারণা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কণা-পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে আবদুস সালাম তাঁর প্রতিভার কালজয়ী স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে। এই সেই ঝাং-এর পাঞ্জাবি কেশোরের কাহিনী— যে একজন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আরো একজন আবদুস সালাম আছেন যিনি সবচেয়ে আধুনিক ইহজাগতিক মানুষ, যান্ত্রীজাগতিক কূটরাজনীতিতে যিনি সমান দক্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান সংগঠনের জন্য একজন অক্লান্তকর্মী মানুষ— যার স্বদেশ হল সারা পৃথিবী।

১৯৫১ সালে যখন সালাম কেমব্রিজের পুষ্পশোভিত পরিচিত জগত ছেড়ে লাহোরের দক্ষ অপরিচিত জগতে ফিরে আসেন, তখন চার বছর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান ছিলেন। এই সময়ে তাঁকে নাকি ফুটবল ক্লাবেরও প্রধান করে দেয়া হয়। তবে এটা কতখানি সত্য বলা মুসকিল, কেননা খেলাধুলায় তাঁর বিশেষ কোন যোগ্যতা

ছিল এমন দাবি তিনি কখনও করেননি। তবে একথা সত্য যে, লাহোরের কর্মজীবনের পরিবেশে চরম হতাশাবোধ তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে বাধ্য করে এবং তাঁর কথামতো তিনি অনিশ্চার সপে 'মগজ পাচারের' শিকার হলেন। তিনি বলেছেন, 'অন্যান্য পদার্থবিজ্ঞানী কি চিন্তা করছেন তা আপনাকে জানতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। আমার ভয় হয়েছিল যে, আমি যদি লাহোরে থাকি তবে আমার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তারপর আমার দেশের কোন কাজে আমি লাগব?' অবশ্য সারাজীবন লন্ডন-ট্রিয়েস্টে বসবাস করে সালাম তাঁর দেশের জন্য, তাঁর দেশের বিজ্ঞানের জন্য সেরকম দীর্ঘস্থায়ী কিছু করতে পেরেছেন এমন কথা হয়তো বলা যায় না। তবু পদার্থবিজ্ঞানের জন্য এই বিশেষ 'মগজ পাচার' যে জরুরি ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

আবদুস সালাম তাঁর নিজের দেশের বিজ্ঞানের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু না করতে পারলেও তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীদের তিনি কখনও ভোলেননি। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আহত শান্তির জন্য পরমাণু সম্মেলনের তিনি বৈজ্ঞানিক সচিব ছিলেন। ভারতের হোমি ভাবা ছিলেন সভাপতি। ঐ বিখ্যাত সম্মেলন অনেকের মতো সালামকেও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চিন্তা এখান থেকেই তাঁর মনে আসে এবং তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে পরে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থায় তিনি এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নানা দেশে অক্লান্ত লবি করতে দেখেছি এবং ট্রিয়েস্টের ওভারডানে যখন এই কেন্দ্রটি প্রথম স্থাপন করা হয় সেসব দিনের স্মৃতি আজো আমাদের অনেকের মনে উজ্জ্বল। প্রথম দিকে আমেরিকা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এমনকি ভারতও এই কেন্দ্রের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না এবং কোন কোন দেশ সক্রিয়ভাবে এর বিরোধিতা করেছে যদিও পরবর্তীকালে এইসব দেশই এই কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রের খরচের বেশির ভাগই যুগিয়েছে ইতালি সরকার, তারাই কেন্দ্রের জন্যে এড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ওপরে এমন একটি অপূর্ব আন্তর্জাতিক কেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছেন যার তুলনা মানুষের ইতিহাসে আর নেই। বিজ্ঞানের মানচিত্রে এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রকে চিরস্থায়ী করার কৃতিত্ব অবশ্য আবদুস সালামের এবং তাঁর সহকর্মীদের, যাদের মধ্যে বুভিনিচ, ফ্রান্সডাল, বারুট, স্ট্যাথডি এবং ডেলবুর্গের নাম অবশ্যই করতে হয়। তাঁরাই বিশ্বের প্রথম সার্থক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী।

ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য বিজ্ঞানী আসেন। এখনো তাঁর আসেন নতুন জ্ঞান লাভের জন্যে এবং তাঁদের নিজেদের বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে যা পরেপারে জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এভাবেই ট্রিয়েস্ট কেন্দ্র 'মগজ পাচার' বন্ধ করবে আশা করেছিলেন আবদুস সালাম। সেটা অবশ্য হয়নি কিন্তু সেজন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্যের কবল থেকে মেধাবী উন্নত-ভরতী মুক্তি পেতে চাইবে, এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং এই দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মেধাবী

বিজ্ঞানীকে রক্ষা করা একটিমাত্র কেন্দ্রের পক্ষে যে সম্ভব নয়, এটা আবদুস সালামও বোঝেন। তাই তিনি শেষজীবনে সারা পৃথিবীতে এই ধরনের অন্তত বিশটি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন— যার মধ্যে বাংলাদেশের নামও আছে।

আসলে অনুন্নত দেশগুলির বিপ্লবিত অবস্থা সম্বন্ধে আবদুস সালাম যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে মর্মস্পর্শী ভাষায় সোচ্চার তেমন বোধ হয় আর কেউই নয়। ষ্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক শোষণের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার পর আবদুস সালাম ওমর খৈয়ামের এই কয়েকটি পঙ্ক্তি আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন,

আঃ ভালবাসা! তুমি আর আমি ভাগ্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে
দুঃখজনক সব ব্যাপারের নকশা যদি একত্র করতে পারতাম,
তাহলে কি আমরা এসব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করতাম না?
আর তারপরে আমাদের অন্তরের অন্তরতম ইচ্ছা অনুসারে
আবার তা নতুন করে গড়ে তুলতাম না?

তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য তাকে গভীরভাবে ব্যথিত করত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেই যে দারিদ্র্যের অভিশাপ মোচন করা যায়, একথা তিনি তিরিশ বছর ধরে দেশে দেশে চারণকবির মতো বলে বেড়িয়েছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘আমার কাছে সবসময় অত্যন্ত আশ্চর্য লেগেছে যে, ধনী দেশের কত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পৃথিবীর দারিদ্র্যের তীব্রতা সম্বন্ধে বাস্তবিকই সচেতন।’

তিনি বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে কখনোই দেখতে চাননি— সারাদেশের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই তিনি সারাজীবন বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের সকলের বোঝা উচিত যে, এই বিজ্ঞান মোটেই চটকদারি প্রকৃতির নয়, এখানে প্রধানত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই বলা হয়। অতি পরিচিত প্রযুক্তির কিছু কিছু দক্ষতা অর্জনের এটা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমাদের মানবিক এবং বস্তুগত যে সম্পদ রয়েছে তারই সবচেয়ে ভাল প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবহারের চিন্তাশীল হিসাব-নিকাশই হল এই বিজ্ঞান।’

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দক্ষতা অর্জনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যদি তৃতীয় বিশ্ব একদিন সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করে তবে আবদুস সালামের নাম অবশ্যই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তখন উচ্চারিত হবে। এখন যেমন তাঁর নাম কণা-পদার্থবিজ্ঞানে প্রায় প্রতিটি বাক্যে উচ্চারিত হয়।

এথেন্স নগরীর পাশে পের্টো যে একাডেমি স্থাপন করেছিলেন আড়াই হাজার বছর পরে ঝাং-এর এক তরুণ সেই একই স্বপ্ন, সেই একই দুরাশা আরো ব্যাপক আকারে, আরো আন্তর্জাতিক রূপে বাস্তবায়িত করেছেন। ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রের দোতলার শেষের ঘরটিতে ধ্যানমগ্ন এই বিজ্ঞানী এথেন্সের সেই দার্শনিককেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ জ্ঞানের প্রথম পাঠ নিয়েছে।

banglainternet.com